POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَلِاَنۡفُسِكُمۡ ؕ
وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ اللّٰهِ ؕ
وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يُّوَفَّ اِلَيۡكُمۡ
وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ ○ (سورة البقرہ:273)

‘এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আত্মার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক, এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না ।’

(সূরা:আল বাকারা, আয়াত: ২৭৩)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
43

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 25 অক্টোবর , 2018 15 সফর 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের ‘আমাদের শিক্ষা ’ অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

সূরা ফাতেহায় এত সত্য, সূক্ষ্ম ও তত্বজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে যাহা লিখিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থেও তাহার সংকুলান হইবে না। এই প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ দোয়াটির প্রতি লক্ষ্য করুন যাহা সূরা ফাতেহায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ‘ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম’ এই দোয়ায় এমন এক পূর্ণ তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র চাবিস্বরূপ।

‘কিশতিয়ে নূহ’ পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

অতঃপর মসীহ্ দেশ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তোমরা শুনিয়াছ যে, শ্রীগরে, খানইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। এই সবই পীলাতের চেষ্টার ফল, কিন্তু তথাপি সেই প্রথম পীলাতের যাবতীয় কার্য ভীরুতার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। ‘আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন অপরাধ দেখিতে পাইতেছি না।’ বলিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী যদি তিনি মসীহ্‌কে মুক্ত করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় ছিল না, এবং মুক্তি দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল, কিন্তু রোমান সম্রাটের নাম শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। পক্ষান্তরে এই শেষ পীলাত পাদরীদের ভীড় দেখিয়া ভীত হইলেন না, অথচ এ স্থলেও ব্রিটিশ শাসন ছিল, কিন্তু এই ব্রিটিশ সম্রাট সেই রোমান সম্রাট অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই চাপ সৃষ্টি করিয়া বিচারককে ন্যায়চ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাটের ভয় দেখানো কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যাহা হউক প্রথম মসীহ্‌র তুলনায় শেষ যুগের মসীহ্‌র বিরুদ্ধে অনেক বেশী আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধবাদীরাও সমস্ত জাতির অধিনায়কগণ সকলেই একত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ যুগের পীলাত সত্যের সমাদর করিলেন এবং তাঁহার সেই উক্তি পূর্ণ করিয়া দেখাইলেন যাহা তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমি আপনাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করি না।’ সুতরাং তিনি সাহসিকতার সহিত আমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রথম পীলাত মসীহ্‌কে বাঁচাইবার জন্য ফন্দি-কৌশলের আশ্রয় নিয়াছিলেন কিন্তু এই পীলাত ন্যায়-বিচারের যাবতীয় দাবী এরূপভাবে পূর্ণ করিলেন যে, তাহাতে ভীরুতার নাম গন্ধও ছিল না। যেদিন আমি মুক্তি লাভ করি সেই দিন মুক্তি সেনার এই চোরকে উপস্থিত করা হইয়াছিল। এরূপ ঘটিবার কারণ এই ছিল যে, প্রথম মসীহ্‌র সঙ্গীও এক চোর ছিল, কিন্তু শেষ মসীহ্‌র সঙ্গী ধৃত চোরকে প্রথম মসীহ্‌র সঙ্গী ধৃত চোরের ন্যায় ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় নাই এবং তাহার হাড়ও ভাঙ্গা হয় নাই বরং তাহার মাত্র তিন মাসের কারাদন্ড হইয়াছিল।

এখন আমি পুনরায় আমার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে লিখিতেছি যে, সূরা ফাতেহায় এত সত্য, সূক্ষ্ম ও তত্বজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে যাহা লিখিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থেও তাহার সংকুলান হইবে না। এই প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ দোয়াটির প্রতি লক্ষ্য করুন যাহা সূরা ফাতেহায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ এই দোয়ায় এমন এক পূর্ণ তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র চাবিস্বরূপ। আমরা কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি না এবং তদ্দারা উপকৃত হইতে পারি না, যে পর্যন্ত আমরা সেই বিষয় লাভের সঠিক পথ না পাই। দুনিয়ার যত কঠিন ও জটিল বিষয় আছে, তাহা রাজত্ব বা মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধীয়ই হউক, বা রণকৌশল ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিতই হউক, বা প্রকৃতি ও পদার্থ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কিতই হউক, বা শিল্প, চিকিৎসা পদ্ধতি, রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধেই হউক, কিংবা ব্যবসা ও কৃষি সংক্রান্তই হউক, এই সমুদয় কার্য কিভাবে আরম্ভ করিতে হইবে সেই সঠিক পথের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত উহাতে কৃতকার্য হওয়া সুকঠিন ও অসম্ভব। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বিপদের সময় বিপদমুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া দিবা-রাত্রি চিন্তা ভাবনা করা আপন অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করে। প্রত্যেক শিল্প, আবিষ্কার এবং সমুদয় জটিল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় পন্থা লাভ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পার্থিব ও ধর্মীয় যাবতীয় উদ্দেশ্য লাভের জন্য প্রকৃত দোয়া হইল উপায় উদ্ভাবনের জন্য দোয়া। কোন বিষয়ে সহজ ও সঠিক পন্থা লাভ হইলে খোদাতা'লার ফযলে সে কার্যও নিশ্চয় সাধিত হয়। খোদাতা'লার কুদরত ও হিকমত প্রত্যেক উদ্দেশ্য লাভের জন্য একটি উপায় রাখিয়াছে। যথা, কোন রোগের যথাযথ চিকিৎসা হইতে পারে না, যে পর্যন্ত সেই রোগের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য এবং ঔষধের ব্যবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য এরূপ এক উপায় উদ্ভাবিত না হয়, যে সম্বন্ধে বিবেক এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই উপায় অবলম্বনে কৃতকার্যতা লাভ হইবে। বস্তুতঃ দুনিয়াতে কোন কার্য পরিচালনা সম্ভব হইতেই পারে না, যে পর্যন্ত সেই কার্যের জন্য কোন উপায় সৃষ্টি না হয়। সুতরাং উপায় অনুসন্ধান করা প্রত্যেক অভিষ্টান্বেষীর অপরিহার্য কর্তব্য।

যেমন পার্থিব বিষয়ে সফলতা অর্জনের প্রকৃত ব্যবস্থা লাভ করিতে প্রথম এক পন্থা আবশ্যক হয় এবং যাহা অবলম্বন করা যায়, তদ্রূপ খোদাতা'লার প্রিয় এবং তাঁহার প্রেম ও অনুগ্রহের ভাগী হওয়ার জন্যও আদিকাল হইতে একটি

এরপর শেষের পাতায় .....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মাতীন মরিয়ম সিদ্দিকা (শেষ পর্ব)

অনুরূপভাবে আমি সর্বক্ষণ এই চিন্তায় থাকি যে, যেন এমন কোন পন্থা বের হয় যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার মহত্ব এবং পরাক্রম প্রকাশিত হয় এবং তাঁর উপর মানুষের ঈমান তৈরী হয়- এমন ঈমান যা পাপ থেকে রক্ষা করে এবং পুণ্যের নিকটবর্তী করে। আমি এও দৃষ্টিতে রাখি যে আমার উপর আল্লাহ্ তা'লার সীমাহীন কৃপারাজি ও পুরস্কার রয়েছে, সেগুলি বর্ণনা করা আমার কর্তব্য। তাই আমি যখন কোন কাজ করি, সেখানে আমার উদ্দেশ্য থাকে যেন আল্লাহ তা'লার জ্যোতির্বিকাশ ঘটে আর ঠিক অনুরূপই আমীন অনুষ্ঠানেও হয়েছে। ..... যখন তারা আল্লাহ্ তা'লার বাণী পাঠ করল তখন আমাকে বলা হল যে, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যেন কয়েকটি দোয়া সম্বলিত পঙক্তি রচনা করি যেগুলিতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। যেরূপ আমি এই মাত্র উল্লেখ করলাম, সংশোধনের জন্য চিন্তায় থাকি। আমি এই অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত আশিসময় মনে করি আর এইভাবে তবলীগ করা সমীচীন মনে করেছি।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮)

জাগতিকতাকে ধর্মের উপর প্রাধান্যদানকারীদের পরিণামের দিকে কুরআন করীম এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐশী আদেশের অবাধ্য হয় এবং পার্থিব জীবনকে পরলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয় জাহান্নামই তার ঠিকানা।

কিন্তু এর বিপরীতে তিনি বলেন:

'ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি..........আল জান্নাতু হিয়াল মা'ওয়া"। যে ব্যক্তি প্রভু প্রতিপালকের মর্যাদাকে ভয় করল এবং নিজের প্রবৃত্তিসমূহ থেকে বিরত থাকল এবং খোদার কারণে সমাজের সম্পর্কের পরোয়া করল না, নিশ্চয় জান্নাতে তার ঠিকানা।"

এই বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) বলেন:

" খোদা তা'লার আদেশাবলীর একটি অংশ নঙর্থক। অর্থাৎ কিছু বিষয় এমন রয়েছে যেগুলি থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা এমন সব ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ পালন করতে নিষেধ করেছেন যেগুলির কারণে অনেকে নিজেদের সামর্থের অধিক সন্তানদের বিবাহ-অনুষ্ঠানাদিতে খরচ করে ফেলে, যদিও তা অপচয়ের নামান্তর। তারা বলে, আমরা যদি রীতি রেওয়াজ মেনে চলার জন্য খরচ না করি তবে আত্মীয়স্বজনদের সামনে আমাদের নাক কাটা যাবে। খোদা তা'লা বলেন, আমার কারণে রীতি রেওয়াজ বর্জন কর করে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা বরণ কর। অতঃপর তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে সম্মানের নাক দেওয়া হবে।

(আল ফযল, ২০ শে এপ্রিল ১৯৬৬)

যারা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের উপর জাগতিক সম্পর্কে প্রাধান্য দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন- 'সানাসেমুহ আলাল খুরতুম'। ইহ জগতে নিজেদের নাক উঁচু রাখতে তারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীকে গ্রাহ্য করে নি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কিয়ামত দিবসে আমরা তাদের নাক কষ্টিক দ্বারা দহন করে দিব।'

বয়আতের অঙ্গিকার আমাদের কাছে কি দাবি করে?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের আগমণের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। একটি হল এই যে, তাঁর বয়আতের মাধ্যমে যেন মোত্তাকীদের একটি জামাত গঠিত হয় যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। আমরা যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণের পূর্ণ আনুগত্য করে নিজেদেরকে মুত্তাকীদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করি, তবে নিশ্চয় আমরা বয়আতের এই অঙ্গিকার পূর্ণকারী হব যে ধর্ম, ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি বেদনাকে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান এবং সন্তান-সন্ততি ও প্রত্যেক আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা প্রিয় মনে করব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" বয়আতের এই ধারা কেবল মুত্তাকিদের একটি দল লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। যাতে এমন মুত্তাকিদের একটি বিরাট জামাত পৃথিবীতে নিজেদের পুণ্যময় প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের সমন্বয় ও সংহতি ইসলামের জন্য আশিস, মহত্ব ও পরিণাম সৃষ্টিকারী হয়। এবং তারা সেই বরকতময় এক ও অভিন্ন বাণীর উপর ঐক্যমত হওয়ার কারণে ইসলামের পবিত্র সেবার কাজে যথাশীঘ্র কাজে আসে। তারা যেন সেই সমস্ত লোকদের মত উদাসীন, কৃপণ এবং অকর্মণ্য মুসলমান না হয় বা অযোগ্য লোকেদের ন্যায় না হয় যারা নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ এবং অবিচারের কারণে ইসলামের প্রভুত ক্ষতি সাধন করেছে এবং এর অপরূপ শোভাকে নিজেদের দুরাচার দ্বারা কালিমালিপ্ত করেছে। (আমার জামাত) যেন জাতির প্রতি এমন সহানুভুতিশীল হয় যে, তারা দরিদ্রদের পরিত্রাতা এবং অনাথদের পিতায় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর তারা ইসলামী কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে উন্মাদ প্রেমিকের ন্যায় আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তত থাকে আর তাদের নিজেদের যাবতীয় প্রচেষ্টা যেন এই কাজে নিয়োজিত থাকে যে, পৃথিবীতে সর্বজনীন কল্যাণের প্রসার হবে এবং ঐশী ভালবাসা এবং খোদার বান্দাদের প্রতি সহানুভুতির এক নির্ঝর প্রত্যেকের হৃদয় থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে একস্থানে মিলিত হবে এবং তা এক বিশালকায় নদী রূপে প্রবাহিত হতে দেখা যাবে। খোদা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, কেবল নিজের কৃপা ও বিশেষ নিদর্শন দ্বারা এই অধমের দোয়া এবং মনোযোগকে তাদের পবিত্র শক্তি-সামর্থের বিকাশের মাধ্যম করে দিবেন। সেই পবিত্র ও মহাপরাক্রমশালী সত্তা আমাকে শক্তি দিয়েছেন যাতে আমি মুত্তাকি ছাত্রদের অভ্যন্তরীন তরবীয়তের কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং তাদের কলুষতা দূর করার জন্য অহর্নিশি প্রচেষ্টারত থাকি এবং তাদের জন্য সেই জ্যোতি যাচনা করি যার দ্বারা মানুষ প্রবৃত্তি ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদার পথকে ভালবাসতে শুরু করে। ... আর আমি বিশ্বাস করি যে, যারা জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধৈর্যসহকারে প্রতীক্ষা করবে, তাদের জন্য এমনটিই হবে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা: ৫৬১-৫৬৩)

অতএব আমরা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফার হাতে বয়আত করেছি, আমাদের উচিত তাঁদের নির্দেশানুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করা। যাবতীয় প্রকারের রীতি রেওয়াজ ও সামাজিক কদাচার পরিহার করে কেবল আল্লাহ তা'লার জন্য জীবনযাপন করা। আমাদের মধ্যে যেন এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং তার দিপ্তী যেন চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। আমরা যেন ইসলামি আশিসরাজির জন্য দৃষ্টান্ত হই এবং সেই সমস্ত লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদেরকে আল্লাহ্ গ্রহণীয়তার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং তাঁর সাহায্য লাভ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল শরিয়ত বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করে এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃজন করা। সেই নতুন আকাশ ও পৃথিবী তখনই তৈরী হতে পারে, যখন প্রকৃত তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা পুরনো আকাশ ও পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পদদলিত করে সেই কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অবলম্বন করব যা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভুতি, দীর্ঘলালিত সামাজিক অভ্যাস ও রীতি রেওয়াজ এবং জাগতিক মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিক্ততাপূর্ণ জীবন বরণ করে নিই।

আমরা প্রত্যহ নামাযে কতবারই না আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া প্রার্থনা করি যে, 'ইহদেনাস সেরাতাল মুসতাকিম', অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, এমন পথ যা সরাসরি তোমার পানে যায়। এই সোজা পথ আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী ও নির্দেশাবলীর উপর আমল করার সুবাদে অর্জিত হতে পারে। এই পথ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফগণের নির্দেশাবলী আমল করার কল্যাণে অর্জিত হতে পারে। খোদা করুক আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে সরল পথে পরিচালিত হয়ে খোদার নৈকট্য লাভের পথে অগ্রসর হোক। আমীন।

আহমদী নারীদের কর্তব্য

লাজনা ইমাউল্লাহ্র সমস্ত সদস্যা এবং আহমদী মহিলাদের কর্তব্য হল হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.)-এর বিভিন্ন আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেগুলির উপর আমল করার পাশাপাশি সামাজিক কদাচার পরিহার করার আহ্বানেও পূর্ণ উদ্যম প্রদর্শন করি। মহিলারা নিজেদের নিবুর্দ্ধিতা, অজ্ঞতা এবং কুরআন করীমের শিক্ষার বিষয়ে অনবহিত হওয়ার কারণে এবং আত্মীয়স্বজন ও সমাজের মোকাবেলা করার সাহস না থাকার কারণে সেই সমস্ত রীতি রেওয়াজের পঙ্কিলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যেগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর প্রারম্ভিক যুগের মান্যকারীরা তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি ও পুণ্যময় সহচর্যের ফলে পরিহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইসলামের পুনর্জীবন লাভ এক ত্যাগ স্বীকার দাবি করে, আর সব থেবে বড় ত্যাগস্বীকার হল নিজেদের কামনা-বাসনা এবং আবেগ অনুভুতিকে পদদলিত করে আমাদের জীবনকে যাবতীয় রীতি রেওয়াজ, কদাচার এবং দেখনদারি থেকে মুক্ত করে কেবল আল্লাহতে বিলীন হয়ে যাওয়া। হে আল্লাহ্ তুমি এমনটিই কর।

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.)-এর দুই সম্মানীয় সাহাবা হযরত উমারাহ বিন হাযম এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহুমার জীবনালেখ্য নিয়ে আলোচনা

রসুলে করীম (সা.) বলেন, চারটি বিষয় এমন রয়েছে, কোন ব্যক্তি যেগুলির আমল করলে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর সেগুলির মধ্যে একটি ত্যাগ করলেও বাকি তিনটি কোন উপকারে আসবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ যিনি কুরাইশী ছিলেন না, হুযায়েল গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল, খুবই দরিদ্র মানুষ ছিলেন আর কুরাইশ নেতা উকবা বিন আবু মুয়ায়েতের মেষপাল চরাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.)-এর সংস্রব প্রাপ্ত হয়ে একপর্যায়ে একজন অনেক বড় বিদগ্ধ আলেম হয়ে যান।

রসূলে করীম (সা.)-এর পর মক্কায় প্রকাশ্যে মহানবীর পর যিনি কুরআন পড়েছেন তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদই ছিলেন।

খোদার এই শত্রুরা আমার দৃষ্টিতে এতটা অসার কখনও ছিল না, যখন তারা আমাকে প্রহার করছিল।

যে ব্যক্তি কুরআনকে এমন প্রাঞ্জলভাবে পাঠ করা পছন্দ করে যেভাবে তা নাযেল করা হয়েছে, তবে তার উচিত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে কুরআনের পাঠ নেওয়া।

চাল-চলন, কথাবার্তা, চরিত্র, রীতি-নীতির দিক থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ মহানবী (সা.) এর সবচেয়ে কাছের মানুষ।

আব্দুল্লাহর পুণ্যের পাল্লা কিয়ামত দিবসে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের আদর্শ এবং পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন। ।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ২৮ সেপ্টেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৮ তাবুক , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন:

আমার সাম্প্রতিক সফরের পূর্বে আমি মহানবী (সা.)-এর যেসব সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের জীবনালেখ্য এবং ঘটনাবলী উপস্থাপন করছিলাম। পুনরায় আজ একই বিষয় আরম্ভ হবে। আজ যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তাদের মাঝে একজন হলেন হযরত উমারা বিন হাজম। হযরত উমারা (রা.) সেই সত্তর জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা উকবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার ভাই হযরত আমার বিন হাজম এবং হযরত মু'মির বিন হাজমও সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদ সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। মক্কা বিজয়ের দিন বনু মালেক বিন নাজ্জারের পতাকে তার হাতেই শোভা পাচ্ছিল। হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত উমারার সাথে হযরত মুহরেজ বিন নাজলার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন । মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর মুরতাদদের ফেতনা বা নৈরাজ্য যখন মাথাচাড়া দেয় এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ করে তাদের বিরুদ্ধেও তিনি হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের পক্ষে যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। (আসহাবে বদর, প্রণেতা- কাযি মহমমদ সুলেমান, পৃষ্ঠা: ১৮২)তার মায়ের নাম ছিল খালেদা বিনতে আনাস। (সীরাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫৫)

আবু বকর বিন মহম্মদ বর্ণনা করনে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাহলকে সাপ দংশন করলে মহানবী (সা.) বলেন, তাকে হযরত উমারা বিন হাজমের কাছে নিয়ে যাও, যেন তিনি দম করতে পারেন। তিনি নিবেদন করললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এতো মৃত্যুর পথ যাত্রী। মহানবী (সা.) বললেন যে, তাকে উম্মারার কাছে নিয়ে যাও, তিনি দম করলেই আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দান করবেন।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৭৭১) নি:সন্দেহে মহানবী (সা.) ই তাকে এই দম করার পদ্ধতি আর দোয়া শিখিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, নাউযুবিল্লাহ মহানবী (সা.) হযরত উম্মারার দম করার মুখাপেক্ষি ছিলেন বা তিনি তা করতে পারতেন না। কিছু মানুষকে বিশেষ কিছু কাজের জন্য তিনি (সা.) নিযুক্ত করে রেখেছিলেন আর এর পিছনে পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তি আর বরকত যা কাজ করছিল তা অবশ্য মহানবী (সা.)-এরই ছিল। সীরাত ইবনে হিশামে লিখা আছে যে,মসজিদে নববীতে মুনাফেকরা আসত আর মুসলমানদের কথা শুনে পরবর্তীতে তাদের নিয়ে হাসি বিদ্রুপ করত, তাদের ধর্ম নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত, অনেক সময় তাদের সামনেও তারা এমন আচরণ প্রদর্শন করত। একদিন মুনাফেকদের মধ্য থেকে কয়েকজন মসজিদে নববীতে সমবেত হয় আর তাদেরকে পরস্পর কানে কানে কথা বলতে মহানবী (সা.) দেখেন। এতে মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দাও, সুতরাং তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে উমর বিন কায়েস বনু গানাম বিন মালেক বিন নাজ্জারের এক সদস্য ছিল যে অজ্ঞতার যুগে তাদের প্রতীমার তত্ত্বাবধায়ন করত। হযরত আবু আইয়্যুব (রা.) তার দিকে যান এবং তাকে পা ধরে টেনে মসজিদ থেকে বের করে দেন। সে তখন বলছিল, হে আবু আইয়ুব! তুমি কি আমাকে বনু সালবার মজলিস থেকে বহিষ্কার করবে? এরপর তিনি (রা.) রাফে বিন বাদিয়ার দিয়ে যান আর সেও বনু নাজ্জারের সাথে সম্পর্ক রাখত, তাকেও তিনি (রা.) তাঁর চাদরে পেঁচিয়ে ফেলেন এবং জোরে টান দেন সেই সাথে তাকে এক চপটাঘাত করে মসজিদ থেকে বের করে দেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা.) বলছিলেন, হে দুশ্চরিত্র মুনাফেক! অভিশাপ তোর ওপর। মহানবী (সা.)এর মসজিদ থেকে বেরিয়ে যা। অপর দিকে হযরত উম্মারা বিন হাজম (রা.) যায়েদ বিন আমরের কাছে যান আর তার দাড়ি ধরে তাকে টেনে বাইরে নিয়ে যান এবং মসজিদ থেকে বের করে দেন। এরপর হযরত উম্মারা তার দুই হাত দিয়ে বুকের ওপর এত জোরে আঘাত করেন যে, সে ধরাশায়ী হয়ে যায়। আর সে বলে, হে উম্মারা! তুমি আমাকে আহত করে দিয়েছো। এতে হযরত উম্মারা বলেন, হে মুনাফেক! খোদা তোকে ধ্বংস করুন। যে শাস্তি আল্লাহ্ তা'লা তোর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন তা এর চেয়ে অধিক ভয়াবহ। তাই ভবিষ্যতে মহানবী (সা.)-এর মসজিদের কাছেও ঘেষবে না।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ২৪৬, বাব মান আসলামা মিন আহবার)

তবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) তবুক অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁর উটের 'কাসওয়া' হারিয়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তার সন্ধানে বের হন। হুযূর (সা.)-এর কাছে হযরত উম্মারা বিন হাজমও ছিলেন, যিনি উকবার বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেভাবে পূর্বেই উল্লেখ করা

হয়েছে আর হযরত উমার বিন হাজম তার ভাই ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উম্মারার হাউদায় যায়েদ বিন সালাত ছিল অর্থাৎ সে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে বাহনের কাজে কিছু দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল অর্থাৎ উটের ওপর মালপত্র ইত্যাদি রাখত। যার সম্পর্ক ছিল বনু কায়েনকা গোত্রের সাথে আর সে ছিল ইহুদী। বাহনের ওপর যে আসন থাকে, সেগুলো দেখা শোনার জন্য কিছু মানুষ নিযুক্ত ছিল, সে ইহুদী ছিল পরে ইসলাম গ্রহণ করে, এরপর কপটতা প্রদর্শন করে। যায়েদ যে মুসলমান হয়েছিল কিন্তু হৃদয়ে কপটতা ছিল, সে অত্যন্ত নিরীহ সেজে বলতে আরম্ভ করে যে, মুহাম্মদ (সা.) কি এই দাবি করেন নি যে তিনি নবী আর তিনি তোমাদেরকে আকাশের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন? অথচ এখন তিনি নিজেই জানেন না যে, উট কোথায় গিয়েছে। সেই সময় রসূলে করীম (সা.) এর পাশে ছিলেন হযরত উম্মারা (রা.)। এই কথা মহানবী (সা.) কোনভাবে অবহিত হন বা আল্লাহ্ তা'লা তাকে অবহিত করেন। তিনি (সা.) বলেন যে, এক ব্যক্তি বলেছে যে, মুহাম্মদ তোমাদেরকে বলে যে, সে নবী আর মনে করে যে তোমাদের আকাশের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করে। অথচ মুহাম্মদ নিজেই জানে না যে, তার উট কোথায়। রসূলে করীম (সা.) বলেন, খোদার কসম! আমি তা ছাড়া কিছুই জানি না যার জ্ঞান আল্লাহ্ আমাকে দেন। অদৃশ্যের সংবাদ আমার জানা নেই, হ্যাঁ, খোদা যদি আমাকে অবহিত করেন তাহলে আমি মানুষকে অবহিত করি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এই মুনাফেকের মুখ বন্ধ করার জন্য বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিতও করেছেন এবং বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উটনি সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তা উমুক উপত্যকায় রয়েছে আর একটি উপত্যকার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেন। সেই উটের লাগাম একটা গাছের সাথে আটকে গেছে। অতএব, যাও আর তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। সুতরাং সাহাবীরা সেখানে যান এবং তাকে নিয়ে আসেন। এই মুনাফেকের মুখ বন্ধ করার জন্যও আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সেই দৃশ্য দেখান যে, উটনি কোথায় আর কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

বায়হাকি এবং আবু নাঈম বর্ণনা করেন হযরত উম্মারা তার হাউদার দিকে যান এবং বলেন, খোদার কসম! আজ এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। এখনই মহানবী (সা.) আমাদেরকে এক ব্যক্তির বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন যার সম্পর্কে খোদা তা'লা তাঁকে সতর্ক করেছেন। মুনাফেকের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লাই যে তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় আর তা ছিল যায়েদ বিন সালাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। হযরত উম্মারার হাউদা থেকে এক ব্যক্তি বলেন, আল্লাহর কসম! আপনি আসার পূর্বে যায়েদ বিন সালাত সেই কথা বলেছে যা আপনি এখন বলছেন যে, মহানবী (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা সেই কথা বলেছেন। আসলে আপনি আসার পূর্বে এ কথা যায়েদ বলেছিল আর এটিই প্রকৃত ঘটনা। এতে হযরত উম্মারা যায়েদকে গলা চেপে ধরেন এবং নিজ সাথিদেরকে বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! আমার হাউদায় একটি সাপ ছিল, আমি তাকে আমার হাউদা থেকে বের করার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম আর যায়েদকে সম্বোধন করে বলেন, ভবিষ্যতে আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। অনেকের মতে যায়েদ পরে তওবা করেছে আর কারো কারো মতে মৃত্যু পর্যন্ত একইভাবে দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল।

(তারিখুল খামীস, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮, গাযওয়া তাবুক)

হযরত যিয়াদ বিন নাঈম, হযরত উম্মারা বিন হাজমের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। যে এগুলোর একটিকেও পরিত্যাগ করে সেক্ষেত্রে বাকী তিনটি তার কোন কাজে আসবে না। হযরত যিয়াদ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আম্মারাকে জিজ্ঞেস করি, সেই চারটি বিষয় কি কি? তিনি বলেন, নামায, যাকাত, রোযা এবং হাজ্জ।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৯)

এই চারটি বিষয়ের ওপর ঈমান আনা এবং আমল করা আবশ্যক। নামায ফরয, যাদের নিসাব পূর্ণ হয় তাদের জন্য যাকাত আবশ্যক, সুস্থ থাকলে রোযা রাখাও আবশ্যক আর হজ্জ পালনের যদি সামর্থ্য থাকে এই অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব পালন করাও আবশ্যক। যাহোক, এই চারটি কথার ওপর ঈমান আনা আবশ্যক আর এর ওপর আমল করাও আবশ্যক। এই কথাগুলো উসদুল গাবায় লেখা আছে। এই সমস্ত গ্রন্থে মুসলমানরা নিজেরাই মুসলমান হওয়ার সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। আর এমন মুসলমান আলেমও তৈরী হয়েছেন যারা কুফরি ফতওয়া দিয়ে থাকে আর মুসলমানের নতুন নতুন পরিভাষা তারা উদ্ভাবন করেছে।

দ্বিতীয় সাহাবী যার আজ স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। তার ডাক নাম হল আব্দু র রহমান, বনু উযায়েল গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক। তার মাতার নাম উম্মে আব্দ। ৩২ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর পিতার নাম ছিল মাসউদ বিন গাফের। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে গণ্য হন। হযরত উমরের বোন হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব এবং তার স্বামী হযরত সাঈদ বিন যায়েদ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তিনিও সে যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮১-৩৮২) মহানবী (সা.)-এর 'দারে আরকামে' প্রবেশের পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১১২) এটি মক্কার সেই জায়গা, যেখানে মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, আমি ৬ষ্ঠ ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ভূপৃষ্ঠে আমরা ছয় ব্যক্তি ছাড়া তখন আর কোন মুসলমান ছিল না। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি যখন ভাল মন্দের পার্থক্য করার বয়সে উপনিত হই, অর্থাৎ সাবালক হই, একদিন উকবা বিন আবু মুয়ায়েতের মেষপাল চরাচ্ছিলাম। এমন সময় মহানবী (সা.) আসেন, হযরত আবু বকরও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) আমাকে বলেন, হে বালক! তোমার কাছে কি দুধ আছে? আমি বললাম, আজ্ঞে আছে কিন্তু আমার কাছে তা আমানত বা গচ্ছিত ধন হিসেবে রাখা হয়েছে, তাই আমি আপনাকে দিতে পারি না। শৈশবেই তার মাঝে অনেক পুণ্য এবং সততা ছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এমন কোন ছাগল নিয়ে আস যা এখনও অন্তসত্ত্বা হয় নি, দুধ দিচ্ছে না। তিনি বলেন, আমি এক প্রাপ্ত বয়স্কা ছাগল তাঁর কাছে নিয়ে গেলে মহানবী (সা.) সেটির পা বেধে দেন এবং তিনি (সা.)ছাগলের স্তনে হাত বুলান এবং দোয়া করেন, এক পর্যায়ে তাতে দুধ নেমে আসে, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) একটি পাত্র নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.) তাতে দুধ দোহান আর হযরত আবু বকরকে বলেন, পান কর, হযরত আবু বকর পান করেন, পরে হুযূর (সা.)ও পান করেন। এরপর পুনরায় তিনি (সা.) স্তনে হাত বুলান এবং বলেন যে, সংকুচিত হয়ে যাও এবং তা সংকচিত হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকেও আপনি যা পড়েছেন তা থেকে কিছু শিখান। এতে মহানবী (সা.)আমার মাথায় হাত বুলান এবং বলেন যে, তুমি সুশিক্ষিত যুবক। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি কুরআনের সত্তরটি সূরা মুখস্ত করেছি।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তার সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নবীঈনে লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ যিনি কুরাইশী ছিলেন না, হুযায়েল গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল, খুবই দরিদ্র এক মানুষ ছিলেন আর কুরাইশ নেতা উকবা বিন আবু মুয়ায়েতের মেষপাল চরাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.)-এর সংস্রব প্রাপ্ত হয়ে একপর্যায়ে একজন অনেক বড় বিদগ্ধ আলেম হয়ে যান। হানাফি ফিকাহ্র ভিত্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর উক্তি এবং ব্যাখ্যার ওপরই।

(সীরাত খাতামুল নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃষ্ঠা: ১২৪)

তার ধর্মীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, লোকেরা জানে যে, আমি তাদের সবার মাঝে আল্লাহ্র কিতাবের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি, কুরআনে এমন কোন সূরা বা আয়াত নেই যা সম্পর্কে আমি জানি না যে, কখন কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাকারী আবু ওয়ায়েল বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ যখন একথা বলেন, তাঁর এই কথাকে কেউ অস্বীকার করে নি। (আসহাবে বদর, সংকলক কাযি মহম্মদ সুলেইমান, পৃষ্ঠা: ১০৭) রসূলে করীম (সা.) যে চারজন সাহাবীর কাছে কুরআন পড়া এবং শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের নাম ছিল তালিকার শীর্ষে। (সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, মানাকেব আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হাদীস- ৩৭৬০) দিবাচা তাফসিরুল কুরআনে হযরত মুসলেহ মওউদ এর বিশদ বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন। যেহেতু মানুষের মাঝে কুরআন মুখস্ত করার আগ্রহ যেহেতু অত্যন্ত বেড়ে যায় তাই মহানবী (সা.) কুরআনের শিক্ষকদের একটি জামা'ত নিযুক্ত করেন, যারা পুরো কুরআন মহানবী (সা.)-এর কাছে মুখস্ত করে মানুষকে পড়াত। তারা চারজন শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষক ছিলেন যাদের কাজ ছিল রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে কুরআন পাঠ করা এবং মানুষকে পড়ানো। এরপর তাদের অধিনে অনেক এমন সাহাবী ছিলেন যারা মানুষকে কুরআন পড়াতেন। এই চার জন বরিষ্ঠ শিক্ষকের নাম হল আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, সালেম মাওলা আবি

হুজায়ফা, মা'য বিন জাবল এবং উবাই বিন কাব। তাদের প্রথম দুজন মুহাজের, দ্বিতীয় দু'জন হলেন আনসারী। কাজের দিক থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ একজন শ্রমিক ছিলেন, সালেম একজন মুক্ত কৃতদাস এবং মা'য বিন জাবল ও উবাই বিন কাব মদীনার নেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক কথায় সকল শ্রেণীর পেশার মানুষকে দৃষ্টিতে রেখে মহানবী (সা.) ক্বারী নিযুক্ত করেছিলেন। হাদীসে এসেছে, রসূলে করীম (সা.) বলেছিলেন خُذُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ وَ مَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ وَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ যারা কুরআন পড়তে চায় এই চার জনের কাছে তাদের কুরআন পড়া উচিত। (এঁরা হলেন) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত সালেম, হযরত মা'য বিন জাবল এবং হযরত উবাই বিন কাব। হযরত মুসলেহ মওউদ আরো লিখছেন, এই চারজন তারা ছিলেন, যারা পুরো কুরআন মহানবী (সা.)-এর কাছে শিখেছিলেন বা তাঁকে শুনিয়ে সংশোধন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এছাড়াও অনেক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে সরাসরি কিছু না কিছু কুরআন শিখতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ একবার একটি শব্দ অন্যভাবে পড়েন। এতে হযরত উমর তাকে বাধা দেন এবং বলেন, এটি এভাবে নয় এভাবে পড়া উচিত। এতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, না, রসূলে করীম (সা.) আমাকে এভাবেই শিখিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) তাকে সাথে নিয়ে মহানবীর কাছে যান এবং রসূলে করীম (সা.)-কে বলেন, ইনি কুরআন ভুল পড়ছেন। হুযূর (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আমাকে পাঠ করে শোনাও। তিনি যখন মহানবী (সা.)-কে শোনান তখন হুযূর (সা.) বলেন, এটিতো ঠিক আছে। হযরত উমর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই শব্দটি তো আপনি আমাকে ভিন্নভাবে শিখিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যেভাবে পড়ছো সেটিও সঠিক। হযরত মুসলেহ মওউদ এর যে উপসংহার টেনেছেন, তাহল এটি থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে কেবল এই চারজন সাহাবীই কুরআন পড়তেন না বরং অন্যরাও পড়তেন। সুতরাং হযরত উমরের এই প্রশ্ন যে, আপনি আমাকে এভাবে পড়িয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত উমরও মহানবী (সা.)-এর কাছে পড়তেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪২৭-৪২৮)

আরেকটি হাদীসে এসেছে রসূলে করীম (সা.)-এর পর মক্কায় প্রকাশ্যে মহানবীর পর যিনি কুরআন পড়েছেন তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদই ছিলেন। এই ঘটনার বিবরণ এভাবে পাওয়া যায়, একদিন সাহাবীরা সমবেত ছিলেন আর পরস্পর বলছিলেন যে, কুরাইশ উচ্চস্বরে কখনও কুরআনের তেলাওয়াত শোনে নি, কেউ শোনাতে পারে কি? হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, আমি শোনাতে পারি। লোকেরা বললো, আমাদের আশঙ্কা রয়েছে যে, কোথাও কাফেররা তোমাকে কষ্ট না দেয়। তুমি একজন শ্রমজিবী মানুষ, তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে কাফেররা তাকে মারতে চাইলেও তার গোত্র তাকে রক্ষা করবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, এর চিন্তা করবে না, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে রক্ষা করবেন। বিস্ময়কর উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিকতা ছিল সাহাবীদের মাঝে। পরের দিন সকালে সূর্যোদয়ের পর তিনি মকামে ইবরাহিমে পৌঁছে সুউচ্চস্বরে কুরআনের তেলাওয়াত আরম্ভ করেন। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আর রহমান আল্লামাল কুরআন" পাঠ করা আরম্ভ করেন। কুরাইশরা তাদের বৈঠকেই ছিল, তার এই কর্ম দেখে তারা আশ্চর্য হয়। কেউ কেউ বলতে থাকে, এতো সেই সব বাক্যগুচ্ছ থেকে পাঠ করছে যা মুহাম্মদ (সা.) বর্ণনা করেন। এটি শুনে সবাই উঠে দাঁড়ায় এবং তার মুখে প্রহার করা আরম্ভ করে। কিন্তু তিনি পাঠ করা অব্যাহত রাখেন, যতটা পাঠ করার সিদ্ধান্ত করেন ততটাই পাঠ করেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ পরে যখন সাহাবীদের কাছে ফিরে যান তখন তার মুখে চপেটাঘাতের চিহ্ন ছিল, তা দেখে সাহাবীরা বলেন যে, আমাদের এই আশঙ্কাই ছিল যে, তুমি প্রহৃত হবে। তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, খোদার এই শত্রুরা আমার দৃষ্টিতে এতটা অসার কখনও ছিল না, যখন তারা আমাকে প্রহার করছিল। তোমরা যদি চাও তাহলে কালও আমি এমনটি করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। সাহাবীরা বলেন, না, এতটাই যথেষ্ট, তুমি তাদেরকে সেই জিনিস শুনিয়েছ যা তারা শোনাই পছন্দ করত না।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর রসূলে করীম (সা.) তাকে নিজের কাছে রেখে দেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সেবা করতেন। মহানবী (সা.) তাকে বলে রেখেছিলেন যে, যখন তুমি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাও আর ঘরের পর্দা সরানো থাকে তবে অনুমতি ছাড়াই ভিতরে চলে এস। আর যদি পর্দা টানা থাকে তাহলে অনুমতি ছাড়া আসবে না। পর্দা সরানো থাকলে, দরজা খোলা থাকলে আমার কণ্ঠস্বর যদি শোন তাহলে ভিতরে চলে আস, তোমার জন্য এর অনুমতি আছে। এর অর্থ হল তখন সেখানে কোন মহিলা নেই। মহানবী (সা.)-এর সকল কাজ তিনি করতেন, তাঁকে জুতা পরাতেন, কোথাও প্রয়োজন হলে সাথে যেতেন। হুযূর (সা.) যখন গোসল করতেন তিনি পর্দা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সাহবীদের মাঝে তিনি সাহেবুস সেওয়াক বা মেসওয়াক আনয়নকারী বলে পরিচিত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তাকে সেহাবুস সেওয়াক, সাহেবুল বেসাদ এবং সাহেবুন নালায়েনও বলা হত।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৩ , দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ মহানবী (সা.)-এর গোপনীয়তা রক্ষাকারী, তাঁর বিছানা প্রস্তুতকারী, তাঁর মেসওয়াক এবং জুতা ইত্যাদি রাখতেন। এতে যে আরবী শব্দ বলা হয়েছে সে শব্দগুলো হল তিনি তাঁর বিছানা বিছাতেন, মেসওয়াক আনতেন, ওজু করাতেন ও মহানবী (সা.) এর গোসলের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর বিছানা বিছাতেন, যে বিছানা বিছিয়ে থাকে তাকে আরবীতে 'সাহেবুস সওয়াদ' বলা হয় আর তাঁর পবিত্র জুতা যথাস্থানে রাখা এবং ঠিক করার কাজও তিনি করতেন, তাই তাকে 'সাহেবুন নালাঈন'ও বলা হত। ওজুর পানিও তিনি রাখতেন। মহানবী (সা.) যখনই সফরে থাকতেন এই কাজ করার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যাস্ত ছিল।

আবু মালিহর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন গোসল করতেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ পর্দা করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এছাড়া তিনি (সা.) যখন ঘুমাতেন তখন ঘুম থেকে জাগ্রত করার দায়িত্ব পালন করতেন, সফরে তাঁর (সা.) সাথে তিনি সশস্ত্র অবস্থায় যেতেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৩ , দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আবু মুসা বর্ণনা করেন, আমরা যখন ইয়ামান থেকে নতুন আসি, আমরা এটিই মনে করতাম যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রসূলে করীম (সা.)-এর আহলে বায়তের (বংশধরদের) অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাঁর এবং তাঁর মায়ের রসূলুল্লাহর ঘরে আনাগোনা অনেক বেশি ছিল। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত) তাঁর মাও কাজ করতেন তাই মহানবী (সা.) এর ঘরে অনেক বেশি আসা যাওয়া ছিল। এই দেখে তিনি বলেন, আমরা এটিই মনে করতাম যে, এও রসূলে করীম (সা.)-এর আহলে বায়তের (বংশধরদের) অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ মদীনা এবং ইথিয়পিয়া উভয় হিজরতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দকএবং বয়আতে রিজওয়ানে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পর ইয়ারমুকের যুদ্ধেও যোগদান করেন। তিনি সেইসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় জান্নাতের শুভসংবাদ দিয়েছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

বদরের যুদ্ধে আবু জাহলকে তার (ঘৃণ্য) পরিণতিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদেরও ভূমিকা রয়েছে। হযরত আনাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধের সমাপ্তিতে মহানবী (সা.) বলেন, কেউ আছে কি যে আবু জাহল সম্পর্কে গিয়ে সঠিক সংবাদ নিয়ে আসবে, তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ যান আর আবু জাহলকে মারাত্মক আহত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পান, যে কিনা মৃত্যুর প্রহর গুনছিল। আফরার ছেলেরা তার এই পরিণতি করেছিল। হযরত ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমিই কি আবু জাহেল? সে তখন সেই অবস্থাতেও বড় দর্পের সাথে উত্তর দেয় যে, আমার চেয়ে বড় সর্দারও কি তোমরা কখনও হত্যা করেছ?

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, কাতলু আবি জাহাল, হাদীস-৩৯৬২)

প্রথম হাদীসটি ছিল বুখারী শরীফের। এবিষয়ে সহি মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে। সহি মুসলিমের বর্ণনা হল- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তার দাড়ি ধরে টেনে বলেন, তুই কি আবু জাহল? তখন আবু জাহেল বলে, আজকের পূর্বে আমার চেয়ে বড় কোন মানুষকে কি হত্যা করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, আবু জাহল বলে যে, হায়! আমি যদি কৃষকের হাতে মারা না যেতাম!

মদীনার দুই কিশোর তাকে এই পরিণতি করেছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তফসিরে কবীরে এর বিবরণ তুলে ধরেছেন যে, কীভাবে শত্রু ঈর্ষার আগুনে সারা জীবন জ্বলতে থাকে আর মৃত্যুর সময়ও একই আগুনে জ্বলছিল। তিনি লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, যুদ্ধের পর আমি দেখলাম, আবু জাহল এক জায়গায় গুরুতর আহত হয়ে কাতরাচ্ছিল, আমি তার কাছে যাই এবং বলি কি অবস্থা তোমার, সে বললো, মৃত্যু নিয়ে আমার কোন দু:খ নেই, মৃত্যই সৈন্যদের পরিণতি। আমার দু:খ হল মদীনার দুই আনসারী ছেলের হাতে আমার মৃত্যু ঘটছে। এখন তুমি শুধু আমার প্রতি এতটা অনুগ্রহ কর আমি তো মরছি, তরবারী দ্বারা আমার মাথা কেটে ফেল, যেন আমার কষ্টের অবসান হয়। কিন্তু দেখ আমার গলা একটু লম্বা করে কেট, কেননা সেনাপতিদের গলা সব সময় লম্বা কাটা হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, আমি তোমার এই শেষ বাসনাও পূর্ণ হতে দিব না আর চিবুক ঘেষে তোমার মাথা কাটব। সুতরাং তিনি চিবুকের কাছে তরবারী রেখে তার শিরোচ্ছেদ করেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ, কত বড় ভয়াবহ অগ্নি ছিল, যা আবু জাহলকে জ্বালিয়ে ছাই করছিল। সারা জীবন এই আক্ষেপেই জ্বলতে থাকে যে, মহানবী (সা.)-এর যে ক্ষতি করতে চাইতাম তা করতে পারি নি, অতঃপর মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে যেই অবস্থার সম্মুখিন হয় তখনও এই অগ্নিতে জ্বলছিল যে, মদীনার দু'জন অনভিজ্ঞ কিশোরের হাতে মারা যাচ্ছি। আর মৃত্যুর সময় তার যে শেষ বাসনা ছিল তাও পূর্ণ হয় নি আর চিবুক ঘেষে তার ঘাড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৬১)

এককথায় সকল প্রকার অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় এ পৃথিবী থেকে বিফল মনোরথ বিদায় নিয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, সেই সময় হযরত মা'যবিন জাবলের ঘরে তিনি অবস্থান করেন। কারো কারো মতে তিনি হযরত সাদ বিন খায়সামার ঘরে অবস্থান করেছিলেন। মক্কায় হযরত জুবায়ের বিন আওয়ামের সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়। আঁ হযরত (সা.) মদীনায় হযরত মা'য বিন জাবলকে তার ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন। মদীনার প্রাথমিক দিনগুলোতে তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। মহানবী (সা.) মুহাজেরদের জন্য যখন মসজিদে নববীর পাশে আবাসনের যৎ সামান্য ব্যবস্থা করেন তখন বনী জহুরার কতক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে তাদের সাথে রাখতে কিছুটা সংকোচ করে। যেহেতু তিনি একজন শ্রমজীবি ও দরিদ্র মানুষ ছিলেন আর তারা ছিল ধনী। মহানবী (সা.) যখন এটি জানতে পারেন তখন তিনি তার গরীব এবং দরিদ্র দুর্বল ভাইয়ের জন্য আত্মাভিমান প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কি আমাকে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, তোমরা মানুষের মাঝে ভেদাভেদ করবে? স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ সেই জাতিকে কখনও আশিসমণ্ডিত করেন না, যেই জাতিতে দুর্বলদেরকে তাদের অধিকার দেওয়া হয় না। এরপর হুযূর (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে মসজিদের পাশেই জায়গা দেন আর বনী জহুরাকে মসজিদের পিছনে একটি কোণায় আবাসনের জন্য জায়গা প্রদান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১২-১১৩ , ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

(সীরাত সাহাবা রসুলুল্লাহ্ সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামা, সংকলক- হাফিয মুযাফ্ফর আহমদ, পৃ: ২৭৫, প্রকাশক নাযারত নশর ও ইশাত রাবোয়া, ২০০৯ সাল)

হযরত ইবনে মাসউদএকবার তার নিজের সম্পর্কেই বর্ণনা করছেন যে, একবার মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, আমাকে সূরা নিসা পড়ে শোনাও। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি কি শোনাব? আর এটি তো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। হুযুর (সা.) বলেন যে, আমি চাই যে, অন্য কেউ তেলাওয়াত করুক আর আমি শুনব। তিনি বর্ণনা করেন, আমি তেলাওয়াত আরম্ভ করি আর যখন-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا

(সুরা নিসা, আয়াত-৪২) এই আয়াত 'পর্যন্ত পৌছি অর্থাৎ 'যখন আমরা সকল উম্মতের মধ্য থেকে এক সাক্ষি নিয়ে আসব তোমাকে তাদের সবার ওপর সাক্ষি দাঁড় করাব'- তখন মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু বন্যা নেমে আসে। বর্ণনায় পাওয়া যায়, তখন তিনি (সা.) বলেন যে, অনেক হয়েছে।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত) (সহী বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন-হাদীস- ৫০৫০)

একবার হযরত উমর ফারুক (রা.) আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করে যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! (তাঁর খেলাফতের পরবর্তী কথা এটি) তিনি বলেন, আমি কুফা থেকে এসেছি, সেখানে আমি দেখেছি যে, এক ব্যক্তি না দেখেই কুরআনের আয়াত লেখে,এটি শুনে তিনি ক্রোধের স্বরে বলেন, তুমি ধ্বংস হও। (রাগের সময় এমনভাবে কথা বলা আরবদের এটি রীতি) কে সেই ব্যক্তি? সে ব্যক্তি ভীত -ত্রস্ত অবস্থায় বলে যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ। এটি শুনে হযরত উমরের রাগ প্রশমিত হয় আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি বলতে থাকেন যে, এই কাজের জন্য আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের চেয়ে বেশি অন্য কাউকে যোগ্য মনে করি না।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৮, ১৯৯৮ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

তিনি না দেখে কুরআন করীম লেখতে পারতেন। হযরত উমর বলেন, একবার রাতের বেলা হযরত আবু বকর এবং আমি হুযূর (সা.)-এর সাথে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি নফল নামায পড়ছিলেন আর এতে কুরআন করীম তেলাওয়াত করছিলেন। কেয়ামে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করছিলেন। হুযূর (সা.) দাঁড়িয়ে তার তেলাওয়াত শোনা আরম্ভ করেন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রুকুতে যান এরপর সেজদা করেন। রসূলে করীম (সা.) বলেন, হে আব্দুল্লাহ! এখন তুমি যাই যাচনা করবে তাই দেওয়া হবে। এরপর হুযূর (সা.) সেই স্থান থেকে চলে যান এবং বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে এমন প্রাঞ্জলভাবে পাঠ করা পছন্দ করে যেভাবে তা নাযেল করা হয়েছে, তবে তার উচিত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে কুরআনের পাঠ নেওয়া। এটি মসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত হাদীস।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৬-১৫৭, ১৯৯৮ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুর রহমান ইয়াজিদ বর্ণনা করেন, আমরা হযরত হুযায়ফার কাছে যাই এবং বলি যে, আমাদেরকে এমন ব্যক্তির সংবাদ দিন যার আচার-আচরণ মহানবী (সা.)-এর আচার-আচরণের সবচেয়ে নিকটতর, তিনি সেই কাজই করবে বা তার একান্ত কাছাকাছি কাজ করবে যা মহানবী (সা.) করতেন। আমরা যেন তার কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করি ও হাদীস শিখতে পারি। এতে তারা বলেন,মহানবী (সা.)-এর আচার-আচরণের সবচেয়ে নিকটতর আচার-আচরণ হল আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

রসূলের সুন্নতের ওপর অনুশীলনের আগ্রহ এবং আকর্ষণের চিত্র দেখুন। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীদের যখন জিজ্ঞেস করা হত যে, অভ্যাস এবং আচার আচরণ আর জীবনাচার ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁর সাহাবীদের মাঝ থেকে কে সবচেয়ে বেশি কাছের, যার রীতি নীতি আমরা অবলম্বন করতে পারি? হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেন যে, আমার জ্ঞানে চাল-চলন, কথাবার্তা, চরিত্র, রীতি-নীতির দিক থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ মহানবী (সা.) এর সবচেয়ে কাছের মানুষ। এই কারণেই হয়তো মহানবী (সা.) বলতেন, আমার উম্মতের জন্য আমি সেইসব কথাই পছন্দ করি যা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে পছন্দনীয়। এটি বুখারীর হাদীস।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৬২)

হযরত আলকামার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের রীতি নীতি, তার উত্তম জীবনাচার এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সাথে তুলনা করা হত।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৪ , ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুলাহ বিন মাসউদের পুত্র উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন, তাঁর অভ্যাস ছিল রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত তখন তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন। এক রাতে আমি তাকে প্রভাত পর্যন্ত গুণ গুণ করতে শুনেছি, যেভাবে মৌমাছি গুণ গুণ করে থাকে।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত) অর্থাৎ হালকাভাবে গুণ গুণিয়ে দোয়া করছিলেন বা তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত আলীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি যদি পরামর্শ না করে কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম তাহলে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকেই নিযুক্ত করতাম।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

অপর এক জায়গায় হযরত আলীর এই কথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাবকাতুল কুবরাতে লেখা আছে, হযরত আলীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, আমি যদি মুসলমানদের মজলিসে শূরাকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম তাহলে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকেই করতাম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর কখনও চাশ্‌ত বা সূর্য উঠার পর ঘুমাই নি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৪ , ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ স্ত্রী সন্তানদের ভালোবাসতেন, ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে কাশতেন, উচ্চস্বরে কিছু বলতেন, যেন ঘরের মানুষ প্রস্তুত হতে পারে। তার স্ত্রী হযরত জয়নাব বর্ণনা করেন, একদিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ঘরে প্রবেশ করেন, তখন এক বৃদ্ধা আমাকে তাবিজ পরাচ্ছিলেন। মহিলাদের অনেক সময় তাবিজ-কবজ করার অভ্যাস হয়ে থাকে, হয়তো বা বরকতের উদ্দেশ্যে । জানতেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এটি পছন্দ করবেন না। তাই আমি তার ভয়ে তিনি সেটিকে খাটের নিচে লুকিয়ে ফেলি, যেখানে বসে সে তাবিজ তৈরী করছিল। তিনি আমার কাছে এসে বসেন এবং আমার গলার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, গলায় এই সূতো কিসের? আমি নিবেদন করলাম, এটি তাবিজ। এটি শোনামাত্র তিনি তা ছিড়ে ফেলে দেন আর বলেন যে, আব্দুল্লাহর বংশ শিরক থেকে পবিত্র। আমি হুযূর (সা.)-এর কাছে শুনেছি তাবিজ-কবজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমি নিবেদন করলাম একি বলছেন আপনি, আমার চোখে ব্যাথা হলে অমুক ইহুদীর কাছে তাবিজ নেওয়ার জন্য যেতাম। অনেক সময় আমার চোখে কষ্ট হত, চোখ ফুলে যেত, পানি বের হত, আমি তো ইহুদীর কাছ থেকেই তাবিজ নিতাম আর তার তাবিজে আমি আরাম পেতাম।এতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন,এগুলো সবই শয়তানী কাজকর্ম।তোমার জন্য মহানবী (সা.)-এর এই দোয়াই যথেষ্ট আর সেই দোয়া হল

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে মানুষের খোদা! আমার কষ্ট দূরীভূত কর, তুমি আরোগ্য দান কর, কেননা কেবল তুমি আরোগ্য দিয়ে থাক, তোমার প্রদত্ত আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য কার্যকরী নয়। এমন আরোগ্য যা কোন রোগের চিহ্ন রেখে যায় না।

(সীরাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:২২৫, দারুল ইশাত করাচি থেকে প্রকাশিত)

যারা পীর ফকিরদের দ্বারে যায়, আর এইসব লোক যারা সারাদিন গাঁজা এবং চরস সেবন করতে থাকে আর কখনও নামাযও পড়ে না, তাদের কাছ থেকে তাবিজ কবজ করিয়ে বলে যে, আমরা সুস্থ হয়ে গেছি, আমাদের ওপর অনেক ফযল হয়ে গেছে, আমাদের সন্তান হয়েছে, অমুক কাজ হয়ে গেছে। এইসব কথা এমন লোকদের কথার খণ্ডন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) একবার তার এক বন্ধু আবু উমেরের সাথে দেখা করতে যান, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি তার স্ত্রীকে সালাম করেন এবং পানি চান। ঘরে খাওয়ার পানি ছিল না। তিনি এক সেবিকাকে কোন প্রতিবেশীর কাছ থেকে পানি আনার জন্য পাঠান। অনেকক্ষণ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সে ফিরে আসে নি। আবু উমেরের স্ত্রী এই কারণে তার দাসীকে তীব্র ভর্ৎসনা করে এবং অভিশাপ দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ এটি শুনে পিপাসার্ত অবস্থাতেই সেখান থেকে ফিরে যান। দ্বিতীয় দিন আবু উমেরের সাথে সাক্ষাত হলে এত দ্রুত ফিরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেনআর বলেন পানি পান না করেই চলে গেলেন এর কারণ কি? তিনি উত্তর দেন, তোমার স্ত্রী সেবিকাকে যখন অভিশাপ দিচ্ছিল তখন মহানবীর একটি কথা আমার মনে পড়ে যায় যে, যাকে অভিশাপ দেওয়া হয় সে যদি নির্দোষ হয় তাহলে যে অভিশাপ দেয় সে নিজেই অভিশপ্ত হয়। আমি ভাবলাম, সেবিকা যদি নির্দোষ হয়ে থাকে তাহলে অনর্থক আমি এই অভিশাপ ফিরে আসার কারণ হব।

(সীরাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২২৩, দারুল ইশায়াত করাচি থেকে প্রকাশিত)

তাই পানি পান না করে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। এই হল তাদের খোদা ভীতির চিত্র। কোন কারণে খোদা অসন্তুষ্ট হতে পারেন বলে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকলেও তারা তা এড়িয়ে চলতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ শীর্ণকায় এবং গোদুম বর্ণের মানুষ ছিলেন কিন্তু খুব উন্নত মানের পোশাক পরতেন। সাদা পোশাক পরতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। হযরত তালহার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সুগন্ধির মাধ্যমেই তাকে চেনা যেত।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৭ , ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) কোন কাজের জন্য আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে এক গাছে উঠার নির্দেশ দেন। সাহাবীরা তার শীর্ণ এবং দুর্বল পা দেখে হাসি ঠাট্টা করা আরম্ভ করে। তাদের হাসি ঠাট্টা দেখে মহানবী (সা.) বলেন যে, তিরস্কার কেন করছ, আব্দুল্লাহর পুণ্যের পাল্লা কিয়ামত দিবসে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী হবে।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের চুল এত দীর্ঘ ছিল যে তিনি সেগুলি কানের তুলে রাখতেন। এক রেওয়াতে অনুসারে তার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসত। নামায পড়ার সময় কানের পিছনে চুল রেখে দিতেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:১১৭ , ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত যায়েদ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেন, আমি একদিন হযরত উমরের কাছে বসেছিলাম ততক্ষণে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আসেন। তিনি যেহেতু খর্বকায় ছিলেন তাই অন্য যারা বসে ছিল তাদের মাঝে তিনি প্রায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিলেন। খাটো ছিলেন অন্যরা ছিল দীর্ঘকায় বা এমনভাবে বসে ছিলেন যে বসার কারণে তাকে দেখা যাচ্ছিল না, তিনি প্রায় চোখে পড়ছিলেন না। হযরত উমর (রা.) যখন তাকে দেখে মৃদু হাসেন এরপর হযরত উমর (রা.) তার সাথে কথা বলেন এবং হেসে হেসে কথা বলতে থাকেন। হযরত উমরের সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন হযরত আব্দুল্লাহ দাঁড়িয়ে যান, যেন তাকে দেখা যায় এবং কথা বলতে পারেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি সেখান থেকে চলে যান। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় হযরত উমর পিছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন যতক্ষণ তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে না যান। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন যে, এ ব্যক্তি জ্ঞানে পরিপূর্ণ এক বিরাট পাত্র।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে মকাম এবং মর্যাদার ধারণা এভাবেও পাওয়া যায়, যা হযরত মা'য বিন জাবালের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে আর তাকে অনুরোধ করা হয় আমাদের কোন নসীহত করুন, তখন তিনি বলেন, জ্ঞান এবং ঈমানের এক মর্যাদা রয়েছে। যে সেটি অর্জনের চেষ্টা করে সে সফল হয় আর জ্ঞান এবং ঈমান শেখার জন্য হযরত মা'য বিন জাবল যে চারজন সৎকর্মশীল আলেমের কথা উল্লেখ করেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৫, হাদীস-২২৪৫৫)

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) তাকে কুফাবাসীদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য মুরব্বী হিসেবে পাঠান আর হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করেন। একই সাথে কুফাবাসীদেরকে এটিও লিখেছেন যে, তাঁরা উভয় মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে মনোনিতজন এবং তারা বিশেষ মানুষ, তারা বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা তাদের অনুসরণ কর, তাদের নির্দেশাবলী মেনে চল, তাদের কথা শোন, আমি তোমাদের জন্য আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে আমার চেয়ে শ্রেয় মনে করি।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁকে দেখতে আসেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কোন অভিযোগ আছে কি না, তিনি বলেন, অভিযোগের কথা জিজ্ঞেস করছ, আমার অভিযোগ আমার পাপ সংক্রান্ত যে, আমি এত পাপ করেছি। এরপর হযরত উসমান জিজ্ঞেস করেন আপনার কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? তিনি বলেন, আমি খোদ তা'লার রহমত এবং কৃপা ভিক্ষা চাই। হযরত উসমান বলেন, আপনার জন্য কোন চিকিৎসক প্রস্তাব করব কি, যে আপনার চিকিৎসা করবে? তিনি আবার বলেন, চিকিৎসকই তো আমাকে অসুস্থ করেছে অর্থাৎ আমি খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। এরপর হযরত উসমান (রা.) বলেন, আপনার জন্য কি কোন ভাতা নির্ধারণ করব? তিনি বলেন যে, আমার সে ভাতার প্রয়োজন

শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়....

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হুযুরআনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(পুনঃপ্রকাশন)

তাশাহুদ, তাউ'য এবং তাসমিয়াহ্ পাঠের পর হযরত আমিরুল মোমিনিন খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ) সম্মানীয় অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলেন,- আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার উপর শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। আমি এই সুযোগে সর্বপ্রথম আমাদের অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আজকের অধিবেশনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে এসেছেন। বর্তমানে আমরা খুবই কঠিন এবং বিপদ সঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। যেখানে পৃথিবীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ। পৃথিবীকে গ্রাস করা নৈরাজ্য ও অশান্তি আজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের রাস্তায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুসলমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখবো যে, বেশ কয়েকটি দেশের সরকারতাদের সাধারণ নাগরিকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত। অর্থহীন সংঘর্ষ এবং রক্তপাত এ সব দেশের জাতিগত কাঠামোকে ধ্বংস করছে। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এর অবৈধ ব্যবহার করছে এবং কিছু এলাকা করতলগত করে নিজেদের নাম সর্বস্ব সরকার গঠন করে বসেছে। তারা খুবই ঘৃণ্য ও বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে শুধু নিজেদের দেশেই অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছে না বরং আজকে তারা ইউরোপেও পৌঁছে গেছে এমন নৃশংসতার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হল প্যারিসের হামলা।

পূর্ব ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, রাশিয়া আর ইউক্রেন এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলির আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এছাড়া সম্প্রতি একটি আমেরিকী যুদ্ধ জাহাজের দক্ষিণ চীন সাগরে গিয়ে পড়ার ফলে যুক্ত রাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা এটিও জানেন যে, চীন এবং জাপানের মাঝে বিতর্কিত দ্বীপ নিয়ে বিতন্ডা রয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে কাশ্মীর সমস্যা একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর সমাধানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অনুরূপভাবে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মাঝেউত্তেজনা আঞ্চলিক শান্তিকে পদদলিত করে রেখেছে।

আফ্রীকার কিছু উগ্রপন্থী সংগঠন বেশ কিছু অংশে কব্জা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ব্যাপক হারে সেখানে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করলাম যা পৃথিবীতে আজকাল সংঘটিত হয়ে চলেছে। নয়তো অশান্তি এবং নৈরাজ্যের এমনই আরোও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সুতরাং একমাত্র সিদ্ধান্তে যা উপনীত হওয়া যায় তা হল বিশ্ব এখন সহিংসতা ও নৈরাজ্যের কবলে আক্রান্ত। আধুনিক যুগের যুদ্ধের ক্ষেত্র বিগত যুগ অপেক্ষা ব্যাপকতর। পৃথিবীর কোন একটি অংশের বিশৃঙ্খলা আজ আর সেই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না বরং এর কুপ্রভাব ও ফলাফল অন্যান্য দেশসমূহকেও প্রভাবিত করছে। প্রচার মাধ্যমের উন্নতি এবং গণমাধ্যমসমূহ আজ পৃথিবীকে একটি বিশ্বপল্লীর রূপদান করেছে। পূর্ব যুগে যুদ্ধ শুধুমাত্র সেসব এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব ছিল যারা সরাসরি যুদ্ধের সাথে জড়িত। কিন্তু এখন প্রতিটি সংঘর্ষের ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক রূপ নিচ্ছে। সত্যিকার অর্থে বেশ কয়েক বছর ধরে আমি বিশ্বকে সতর্ক করে আসছি যে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত-এক অঞ্চলের যুদ্ধ অন্য অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হওয়া দুটো বিশ্বযুদ্ধের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা জানতে পারবো যে, সে সময়ের অস্ত্র-শস্ত্র আজকের যুগের মত এতটাই বিধ্বংসী ছিল না। তা সত্ত্বেও বলা হয় যে, প্রায় সাত কোটি মানুষ শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। আর যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের অধিকাংশই ছিল নিরীহ বেসামরিক মানুষ। তাই আজকের ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানী অকল্পনীয় হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার কাছে যা পরমানু অস্ত্র ছিল তা আজকের যুগের পারমণবিক অস্ত্রের ন্যায় ধ্বংসাত্মক ছিল না। তাছাড়া আজকে শুধু পরাশক্তির কাছেই পারমাণবিক বোমা নেই বরং অনেক ছোট ছোট দেশের কাছেও সেই পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলি হয়তো এমন অস্ত্র প্রতিরোধক হিসাবে রাখে কিন্তু ছোট ছোট দেশগুলি যে এভাবে নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আমরা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি না যে তারা কখনো পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করবে না। তাই এটা স্পষ্ট যে পৃথিবী একটা ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আপনাদের দেশকেও এক অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশ লীলার দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। যখন আপনাদের লক্ষাধিক নিরপরাধ দেশবাসীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং পরমাণু বোমার আঘাতে আপনাদের দুটি শহরকে এভাবে বিনাশ করে দেওয়া হয়েছিল যার কারণে মানবতা আজ লজ্জিত। জাপানী জাতি নিজেদের এমন করুণ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে তারা এটা কখনই চাইবে না যে, এ রকম আক্রমণ জাপান অথবা বিশ্বের অন্য কোথাও আবারও করা হোক। আপনারা এমন জাতি যারা পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আপনারা এটিও অবগত আছেন যে, এ রকম বিধ্বংসী অস্ত্র হতে উৎপন্ন কুপ্রভাব এবং কু-ফলাফল শুধুমাত্র একটি প্রজন্ম অবধিই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং আগামী প্রজন্ম ও এতে প্রভাবিত হতে থাকে। আপনারা পরমাণু অস্ত্রের নজির বিহীন কুপ্রভাব অনুভব করতে পারেন। সুতরাং জাপানীদের অপেক্ষা এমন কোন জাতি নেই যারা বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতির গুরুত্বকে বেশি উপলব্ধি করতে সক্ষম।

সৌভাগ্যক্রমে জাপান আজ সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে একটি পরম উন্নত জাতি হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। তাই আপনাদের অতীতের ইতিহাসকে সামনে রেখে আপনাদেরকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীতে জাপানের উপর এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যার কারণে আপনারা আন্তর্জাতিক স্তরে কুটনৈতিক উপায় নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে অপারগ। তা সত্ত্বেও আপনাদের দেশ আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে এবং রাজনৈতিক বিষয়াদীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আপনারা আপনাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তির বার্তা চেষ্টা করা উচিত।

এবছর ইতিহাসের এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের সত্তর বছর পূর্ণ হচ্ছে। যখন কিনা হিরোশিমা এবং নাগাশাকির উপর পরমানু বোমা আক্রমণের দ্বারা আপনাদেরকে ধ্বংস, কষ্ট ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছিল। যেহেতু আপনারা এই ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশলীলার সঠিক মূল্যায়ন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালা তৈরী করেছেন আর যেহেতু আনবিক বোমা আক্রমণের বহু প্রভাব আজও প্রকাশিত হচ্ছে তাই জাপানী জাতি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশি সচেতন।

যেভাবে আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, আপনাদের উপরে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনার একটা দিক এটাও যে, যুদ্ধ পরবর্তীতে জাপানের উপর অপ্রয়োজনীয় এবং স্বেচ্ছাচারীতামূলক নিষেধাজ্ঞা অরোপ করা হয়েছিল। বহু দশক পরেও এসব নিষেধাজ্ঞা ও ভয়াবহ পরিণাম আজ একটি স্থায়ী স্মারকে পরিণত হয়ে থাকবে।

জাপানের উপর পরমাণু হামলার সময় দ্বিতীয় খলিফা যিনি তৎকালীন জামাতে আহ্মদীয়ার প্রধান ছিলেন এই আক্রমণের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন-

"আমাদের ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষার আমাদের কাছে দাবী হল সারা পৃথিবীর সামনে স্পষ্টভাবে একথা বলা যে, আমরা এই বর্বরতা এবং রক্তপাতকে কোন ভাবেই বৈধ মনে করতে পারি না। এতে অনেক সরকার হয়তো আমার সঙ্গে সহমত হবে না। কিন্তু আমি এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না"। তিনি আরো বলেছেন যে,ভবিষ্যতে এসব যুদ্ধ বন্ধ হবে বলে তিনি মনে করেন না। বরং এর ফলে আরও যুদ্ধ, সংঘর্ষ এবং ধ্বংসযজ্ঞ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আজকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী একশতভাগ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও সরকারীভাবে এখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়নি কিন্তু বাস্তবে একটা গৃহযুদ্ধ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। পৃথিবী জুড়ে আজ নারী-পুরুষ এমনকি বাচ্চাদের অবধি খুবই নির্মমভাবে অত্যাচারের নিশানায় পরিণত করা হচ্ছে এবং চরম নিষ্ঠুরতার দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

যতদূর আমাদের সম্পর্ক, আমরা আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত সব

সময় সকল প্রকার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। পৃথিবীর যেখানেই তা হোক না কেন, কেননা ইসলামি শিক্ষার দাবি হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং যাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের সাহায্য করা। আমি ইতি মধ্যেই বলেছি যে, দ্বিতীয় খলিফা (খলিফাতুল মসীহ সানী) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের উপর হওয়া নিউক্লিয়ার বোমা হামলার কিভাবে তীব্র নিন্দা জানিয়ে ছিলেন। এছাড়া খুবই প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত একজন আহমদী মুসলমান যার বিশ্বাঙ্গনে প্রভাব ছিল, তিনি জাপানের জনসাধারণ এবং জাপানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আমি স্যার চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন সাহেবের কথা বলছি। যিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পরে জাতি সংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি বিশ্বের কিছু দেশের সমালোচনা করে বলেছেন, তোমরা অন্যায়ভাবে জাপানের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছো। ১৯৫১ সালে সানফ্রান্সিসকো-তে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন সাহেব বলেন "জাপানের সাথে শান্তির ভিত্তি ন্যায়বিচার এবং মীমাংসার উপর রাখা উচিত, প্রতিশোধ এবং জুলুম অত্যাচারের উপর নয়। ভবিষ্যতে জাপান নিজের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা তাদের অসাধারণ উন্নতির পূর্ব লক্ষণ। আর জাপান শান্তি প্রিয় জাতি গুলির মাঝে অসাধারণ ভূমিকা পালন করবে যা তাদের অসাধারণ উন্নতির পূর্বলক্ষণ। আর জাপান শান্তিপ্রিয় জাতিগুলির মাঝে অসাধারণ ভূমিক পালন করবে।"

তাঁর বক্তৃতার ভিত্তি ছিল কোরআনের শিক্ষাবলী এবং রসুল করীম (সাঃ) এর জীবনাদর্শের উপর। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি বলেন যে, যে কোন যুদ্ধে বিজয়ীদের কখনো অন্যায় করা উচিত নয় এবং বিজিত জাতির উপর অনর্থক বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়। চৌধুরী জাফরুল্লাহ খাঁন সাহেব এই ঐতিহাসিক মন্তব্য জাপানের পক্ষে করেছেন কেননা একজন আহমদী হিসাবে তিনি শুধু পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বই করছিলেন না বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি ইসলামের উৎকৃষ্টতম আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

বার্তা যেভাবে আমি আগেও বলেছি যে, আপনারা এমন জাতি যারা যুদ্ধের পরিণতি ও নিষ্ঠুরতা কেমন হয় তা অন্যান্য জাতিগুলি অপেক্ষা বেশি অনুধাবন করতে পারেন। তাই সকল ক্ষেত্রে, সকল পর্যায়ে জাপান সরকারের সর্বপ্রকার অমানবিক কার্যকলাপ, জুলুম এবং অত্যাচারকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের এটি নিশ্চিন্ত করা উচিত যে, যে ভয়ানক আক্রমণ ও নৃসংশতা হয়েছে ভবিষ্যতে তা যেন আর কোথাও পুনরাবৃত্তি না হয়। যেখানেই যুদ্ধের লেলীহান শিখা ঘনিয়ে আসে জাপানী নেতৃবৃন্দকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। যতদূর ইসলামের সম্পর্ক, কিছু মানুষ একে উগ্রপন্থার ধর্ম মনে করে থাকে। নিজেদের কথার স্বপক্ষে তারা যে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে থাকে তা হল মুসলমান বিশ্বে সন্ত্রাস ও যুদ্ধের কোন শেষ নেই। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। সত্যি বলতে কি শান্তি সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষার এ বিশ্বে কোন তুলনাই হয় না। এ কারণেই দ্বিতীয় খলিফা এবং চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন সাহেব স্পষ্টভাবে আপনাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

আমি এখন খুব সংক্ষেপে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ইসলামের একটি প্রাথমিক নীতি হল এই যে, কোন যুদ্ধ যা ভৌগলিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য করা হয়ে থাকে বা কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে হয়ে থাকে তা কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। এছাড়া কোরআন করীমের সূরা আল নহল এর ১২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, যুদ্ধের সময় যে কোন শাস্তি অপরাধের অনুপাতে হওয়া উচিত এর থেকে বেশি নয়। কোরআন বলে যে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত।

অনুরূপভাবে কোরআন করীমের সূরা অনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যখন দুটি পক্ষের মধ্যে ফাটল তৈরী হয় এবং মানুষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এবং বিরোধী পক্ষ মীমাংসা চায় তখন প্রথম পক্ষের উচিত তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং অল্লাহর উপর নির্ভর করা। কোরআন বলে যে, কোন পক্ষের অভিসন্ধির উপর কখনও কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয় বরং সব সময় মীমাংসার উপায় অন্বেষণ করা উচিত।

কোরআনের এই শিক্ষাই হল আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মৌলিকনীতি।

সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের একথায় প্ররোচিত না করে যে তোমরা ন্যায়বিচার করো না বরং ইসলাম তো এই শিক্ষা দেয় যে, সকল পরিস্থিতিতেই সে পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন তোমাকে সুবিচার করা উচিত এবং ন্যায়-বিচারের পক্ষ নেওয়া উচিত। সুবিচারই সম্পর্কের মাধুর্য্যের কারণ হয়। এবং মনোমালিন্য দূরীভূত করে যুদ্ধের কারণগুলি প্রশমিত করে। সূরা নূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহতা'লা বলেন যুদ্ধের পরে যদি যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তির জন্য তাদের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করো তাহলে শর্তগুলি ন্যায় সম্মত হওয়া উচিত। যাতে তারা সহজ ভাবে তা পরিশোধ করে দিতে পারে। আর যদি তারা কিস্তিতে দিতে চায় তাহলে এটিও উত্তম পদ্ধতি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সোনালী নীতির কথা সূরা আল হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, যদি দুটি দল অথবা জাতির মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যস্থতায় শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর কোন জাতি যদি অন্যায়ভাবে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তাহলে অপরাপর জাতিগুলির সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজনে আগ্রাসী জাতিকে দমনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু আগ্রাসী জাতি যদি যুদ্ধ পরিহার করে তাহলে তাদের উপর অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয় বরং তাদেরকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম জাতি হিসাবে উন্নতির সুযোগ দেওয়া উচিত। আজকের বিশ্বে এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বিশ্বের পরাশক্তিগুলির জন্য এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির জন্য-যেমন জাতিসংঘের জন্য এই নীতি অসাধারণ গুরুত্ব রাখে। তারা যদি এই নীতির অনুসরণ করে তবেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর অনর্থক যে মনোমালিন্য ও অশান্তি আছে তা এর ফলে দূরীভূত হবে।

কোরআনে এভাবে আরও বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে, কিভাবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষকে প্রশমিত করতে হয়। আমাদের

বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তির বার্তা দয়ালু এবং প্রাচুর্য দানকারী খোদা শান্তির চাবিকাঠি আমাদের দান করেছেন। কারণ, তিনি চান যে, তাঁর সৃষ্টরা শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করুক এবং তাদের মধ্যেকার মনোমালিন্য ও মতপার্থক্য দূরীভূত হোক।

সুতরাং এই কথাগুলির সাথে আমি আপনাদের নিকট আবেদন জানাই যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেখানে সম্ভব আপনারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। যেখানে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয় আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হবে ইনসাফের পক্ষে দন্ডায়মান হওয়া ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। যাতে আমরা এমন ভয়াবহ যুদ্ধের থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি, যা আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল। এবং যার ধ্বংসাত্মক ফলাফল কয়েক দশক ধরে প্রকাশ পেয়ে আসছে। বরং আজও প্রকাশিত হচ্ছে। যেখানে সীমিত পরিসরে আর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এমন ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পূর্বে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেএে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমাদের সবার সম্মিলিত ভাবে সহযোগীতার ভিত্তিতে কাজ শুরু করি। আমাদের কাছে এছাড়া আর কোন পথ নেই। কেননা, পুরোমাত্রায় যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তখন ভয়াবহ যে ধংসযজ্ঞ সামনে আসবে তা অকল্পনীয়। এমতাবস্থায় নিশ্চিত রূপে পূর্বে যে যুদ্ধ হয়েছে এ যুদ্ধের সামনে তা কিছুই নয়।

আমি দোয়া করি যে, এ যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পূর্বেই পৃথিবী যেন এর ভয়াবহতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মানুষ যেন আল্লাহতা'লার সম্মুখে সেজদাবনত হয় এবং তারা যেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহতা'লা সেই সমস্ত মানুষকে শুভবুদ্ধি দান করুন, যারা ধর্মের নামে অশান্তির সূত্রপাত করছে বা যারা রাজনৈতিক বা ভৌগলিক স্বার্থে যুদ্ধ ছড়াচ্ছে। আমি দোয়া করবো যে, তারা যেন বুঝতে পারে তারা কত অর্থহীন বিষয়ের পিছনে ছুটছে। আমি দোয়া করি যে, সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি পৃথিবীর সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমীন।

এর মাধ্যমে পুনরায় আপনাদের সবাইকে এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর *(শেষভাগ)*

সফর কালে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর থেকে গৃহীত সাক্ষাতকার সফরের শেষে তাদের সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।

Shingetsu নিউজ এজেন্সির সাংবাদিক মাইকেল পেন হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছিলেন যা সবিস্তারে আলজাযিরা ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। জাপান ছাড়া সারা বিশ্বে এই সাক্ষাতকারটি সমাদৃত হয়। সাক্ষাতকারগ্রহণকারী সাংবাদিক এসম্পর্কে লেখেন-" আল জাযিরা ইংরেজি'তে নাগোয়া মসজিদ উদ্বোধন প্রসঙ্গে আমি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যেটি সপ্তাহব্যাপি ওয়েবসাইটে সর্বাধিক পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি ছিল। ২২ হাজারেরও বেশি ফেসবুক ইউজার্স সেটিকে শেয়ার করেছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, 'যখন থেকে আমি সাংবাদিকতা আরম্ভ করেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এটি আমার জন্য সব থেকে সফল প্রবন্ধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।'

এই সাক্ষাতকার 'আল জাযিরা (ইংরেজি), নিউজ এজেন্সি এবং জামাতে আহমদীয়ার টুইটার একাউন্ট ও ফেসবুকের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে আর জাপানি সংবাদ ছাড়াও ইংরেজি ভাষাভাষি শ্রেণীর মানুষ এবং জাপানে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রবাসীদের কাছে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। এই সাক্ষাতকারটিই সম্পূর্ণ অনুবাদসহকারে ইন্ডোনেশিয়ার সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে।

আল-জাযিরা ওয়েব সাইটে এই সংবাদ প্রকাশিত হলে কিছু অ-আহমদীরা আহমদীদের জন্য 'মুসলমান' শব্দ ব্যবহার করায় আপত্তিও তুলেছে। সাংবাদিক মাইকেল পেন এই আপত্তির উত্তর দিয়ে বলেন, ' আপনাদের দাবি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান আহমদীদেরকে অমুসলিম মনে করে, কিন্তু আমি আহমদী এবং তাদের পথপ্রদর্শক খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। তাদের সকলের দাবি হল তারা মুসলমান। তারা বলে, তাদের ধর্ম হল ইসলাম এবং জামাতের নাম 'জামাত আহমদীয়া মুসলেমা' । আমার মতে যখন তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করছে, তখন তো সেখানেই যুক্তিতর্কের অবসান হয়। যখন তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলছে, তখন আমাকে তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করতে হবে।

সংবাদ মাধ্যমে যেখানে ব্যাপকহারে মসজিদের কভারেজ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে জামতের কিছু বিরোধীরা আপত্তিও তুলছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জাপানিরা নিজেরাই এই সমস্ত আপত্তির উত্তর দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে।

জাপানের ইংরেজি পত্রিকা 'জাপান টুডে'-ও আল জাযিরার ওয়েব সাইট থেকে হুযুর আনোয়ারের ভাষ্য স্পষ্ট হরফে নিজেদের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করেছে। এই সম্পর্কে সাংবাদিক মাইকেল পেন লেখেন- 'জাপান টুডে' আল জাযিরা ওয়েবসাইট থেকে খলীফা মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবের সাক্ষাতকার উদ্ধৃত করে প্রকাশ করেছে। আমার মতে সত্বর এই সক্ষাতকারের ভিডিও প্রকাশিত হওয়া উচিত।'

ঘটনাচক্রে বর্তমানে পশ্চিমা মিডিয়া, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্টে দক্ষিণপন্থীরা জাপান সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করেছে যে, জাপানে মুসলমানেরা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে না, কুরআন করীম প্রকাশ করতে পারে না এবং জাপানে ইসলাম প্রচারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সূত্রে জাপানের সাংবাদিককুল, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং কিছু বুদ্ধিজীবি জাপানের 'মসজিদ বায়তুল আহাদ' -এর উদাহরণ দিয়ে তাদের আপত্তিসমূহের উত্তর দিচ্ছেন। এই কারণেও জাপানে ব্যাপকহারে জামাত আহমদীয়ার পরিচিতি বাড়ছে।

২৪ শে নভেম্বর, ২০১৫ সালে জাপানের সব থেকে জনপ্রিয় পত্রিকা 'দ্যা জাপান টাইমস' মসজিদ উদ্বোধনের সংবাদ প্রকাশ করে লেখে-'আইচি পারফেকচার সুশিমায় মুসলমান জামাতের একটি বিরাট মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। জামাত আহমদীয়া মুসলেমা অনুসারে এই মসজিদে পাঁচশ নামাযির স্থান সংকুলান হবে এবং এটি জাপানের বৃহত্তম মসজিদগুলির অন্যতম।

জামাত আহমদীয়া মুসলেমার বিশ্বনেতা মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব মসজিদের উদ্বোধনের সময় বলেন, ' প্যারিসের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ অত্যন্ত অত্যাচারপূর্ণ আর যারা নিরীহ মানুষদের প্রাণ হরণ করে, বস্তুত তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রকোপকে আমন্ত্রন জানায়। ইসলাম প্রসারের জন্য কোন তরবারির প্রয়োজন নেই। '

পত্রিকাটি লেখে: অনুষ্ঠানে ২৭ টি দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা ছাড়াও স্থানীয় জাপানী, বৌদ্ধ পুরোহিত এবং মঠের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপভাবে গত ২৭শে নভেম্বর তারিখেও নাগোয়া টিভির কর্মীদল মসজিদ এসেছিল এবং সেখানে মসজিদের বাইরে অংশে বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠান এবং জুমার দৃশ্য সম্প্রচার করে।

মসজিদ বায়তুল আহাদের বিষয়ে জাপানীদের কৌতুহল

মিডিয়া কভারেজের কারণে মসজিদের দিকে জাপানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন দল বেঁধে ও ব্যক্তিগতভাবেও মসজিদে আসছে।

হুযুর আনোয়ারের ফিরে যাওয়ার পরের দিনই সাতজন ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে এবং আরও দুটি দল মসজিদ পরিদর্শনের জন্য এসেছিল। অনুরূপভাবে যোহর, আসর এবং মগরিবের নামাযে জাপানী, শ্রীলঙ্কা, তুরস্ক এবং ইন্ডোনেশিয়ার মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করছে। তারা প্রত্যেকে জানায় যে, সংবাদপত্র, টিভির মাধ্যমে মসজিদ সম্পর্কে তারা জানতে পারেন আর মসজিদ এসে তারা অত্যন্ত আনন্দিত।

একজন জাপানী মসজিদে এসে কুরআন করীম এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে। আরেক জাপানী মসজিদ দেখার জন্য এসে বলেন, মসজিদের পবিত্রতম স্থান কোনটি? এটি জানার পর তিনি মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে জাপানীদের প্রথা অনুযায়ী মসজিদের জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। মসজিদে মানুষের যাতায়াত অব্যাহত রয়েছে আর এই মসজিদ জাপানে ইসলামের তবলীগের জন্য এক উপযোগী মাধ্যম প্রমাণিত হচ্ছে।

অনেকে মসজিদের বাইরেই ছবি তুলে ফেসবুক এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মঞ্চে শেয়ার করছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই সফরের কল্যাণে জাপানে ৫ কোটি কুড়ি লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে আর এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় 'মসজিদ বায়তুল আহাদ' -এর উদ্বোধনের মাধ্যমে জাপানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল যা জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর প্রবল আকাঙ্খাকে পূর্ণ করার কারণ হচ্ছে এবং তাঁর হাতে রোপিত বৃক্ষ আজ নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রবর্তিত খিলাফতের ছত্রছায়ায় ক্রমশঃ উন্নতির পথে একের পর এক লক্ষ্য অর্জন করে চলেছে এবং প্রতিটি উদিত দিন এক নুতন বিপ্লবের শুভসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৫৪ সালের ১৯ শে নভেম্বর তারিখে প্রদত্ত খুতবায় বলেন:-

' জাপান কত মহান দেশ। আমরা যদি সেখানে নিজেদের মিশন আরম্ভ করি, আর খোদা করুক সেখানে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আহমদীয়াতের কন্ঠ সমগ্র পূর্ব এশিয়া ধ্বনিত হতে আরম্ভ করবে।"

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানে বায়তুল আহাদ মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আহমদীয়াতের কন্ঠ কেবল জাপানের ভূমিতেই মুখরিত হবে না, বরং এই কন্ঠ সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় ধ্বনিত হবে। কোরিয়া, চিন, তাইওয়ান এবং অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ইসলামের অপরূপ বাণী থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবে এবং পবিত্রাত্মাগুলি সেই বার্তায় সাড়া দিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্ঝর থেকে পরিতৃপ্ত হবে। ইনশাআল্লাহ্।

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহসানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

RTV Nunspeet Radio-এর সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার

আর.টি.ভি নুনস্পীট -এর নিউজ ইনচার্জ ক্যামেরাম্যান এবং সাংবাদিকের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসেন। সাক্ষাতকারটি বায়তুন নুর থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

সাংবাদিক প্রথম প্রশ্ন করেন যে, হুযুর কোন উদ্দেশ্যে হল্যান্ড এসেছেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে হল্যান্ডের জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে Foreign Affairs Commitee আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এটি হল একটি কারণ এখানে আগমণের। এছাড়াও আলমিরেতে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান রয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি পরের দিন রয়েছে আর জামাতের সদস্যদের সঙ্গেও সাক্ষাতের কর্মসূচি রয়েছে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করি, সমস্যাবলী সম্পর্কে অবগত হই এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকি।

নুন স্পীটে থাকার বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমিএখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করব। জায়গাটি ভীষন সুন্দর আর আমার খুব পছন্দের। এখানে আসলে আমি এই জায়গায় থাকাটা উপভোগ করি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি লন্ডনে থাকি, আর এর কারণ হল ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন একতন্ত্রী শাসক জিয়াউল হক জামাতের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করে। আসসালামো আলাইকুম বলার অনুমতি ছিল না আমাদের, ছিল না নামায পড়ার বা ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন করার অনুমতি। আমরা তবলীগ করতে পারতাম না। এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারতাম না যার দ্বারা ইসলামের মতবিশ্বাস প্রকাশ পায়। খলীফাতুল মসীহ এমন শর্তাবলী নিয়ে সেখানে থাকতে পারত না। এই কারণে আমার পূর্বের খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রহ.) বাধ্য হয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করে লন্ডনে অভিবাসন গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে সেখানেই অবস্থান করেন। সেই কাল থেকেই লন্ডনে হেড কোয়ার্টার রয়েছে। ২০০৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। যেহেতু পাকিস্তানের পরিস্থিতি তথৈবচ ছিল। এই কারণে পঞ্চম খলীফার নির্বাচন লন্ডনের ফযল মসজিদে সম্পন্ন হয় আর সেখানে আমাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। সেই সময় থেকেই আমি লন্ডনে অবস্থান করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন নবীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বারা সূচিত কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই খিলাফত ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন এক যুগ আপতিত হবে যখন ইসলাম কেবল নামে মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। এমন যুগ এলে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথ প্রদর্শনের জন্য একজন সংস্কারককে আবির্ভূত করবেন আর তিনি হবেন মসীহ ও মাহদী।

আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণ অবধারিত ছিল তিনি এসে গেছেন আর আমাদের মতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী।

আঁ হযরত (সা.) সেই মসীহ ও মাহদীর আগমণ সংক্রান্ত বহু নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করেছেন। যেগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হল রমযান মাসে বিশেষ তারিখে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, মাহদীর সত্যতার দুটি এমন নিদর্শন রয়েছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া অবধি কারো সত্যতার সপক্ষে এমনভাবে প্রকাশ পায় নি। মাহদীর আবির্ভাবের সময় রমযানে চন্দ্রগ্রহণের তারিখ গুলির মধ্যে প্রথম তারিখে অর্থাৎ রমযানের ত্রয়োদশ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্যগ্রহণের তারিখগুলির মধ্যে মধ্যবর্তী তারিখ অর্থাৎ রমযানের আটাশ তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে। আর এই দুটি নিদর্শন পূর্বে এভাবে কখনো প্রকাশ পায় নি।

সমস্ত মুসলমান একথা বিশ্বাস করে যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় এই নিদর্শন দুটি পূর্ণ হবে। অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর দাবীর পর ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে আর রমযান মাসের সেই দিনগুলিতেই গ্রহণ লাগে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া আরও বহু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁকে গ্রহণ করে নি। আমরা সেই আগমণকারী মসীহ ও মাহদীকে গ্রহণ করেছি।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে ভুট্টু সরকারের নেতৃত্বে অন্যান্য সমস্ত জামাত ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে অ-মুসলিম ঘোষিত করে। এরপর ১৯৮৪ সালে জিয়াউল হক একটি অধ্যাদেশ জারি করে কঠোর আইন প্রণয়ন করে। যে আইন অনুসারে আমরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে পারি না, সন্তানদের নাম ইসলামী নাম অনুসারে রাখতে পারি না, মুসলমানদের মত ইবাদত করতে পারি না, তবলীগ করতে পারি না বা এমন কোন কাজ করতে পারি না যার দ্বারা আমাদের মুসলমান হওয়া প্রকাশ পায়। এই সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার পর আমার পূর্বের খলীফা পাকিস্তান ত্যাগ করেন। খলীফাতুল মসীহর যে কর্তব্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা, পাকিস্তানে থেকে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে সেই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের কেবল নাম অবশিষ্ট থাকবে আর মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে বসবে। এমন যুগ এলে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করবেন। আগমণকারী সেই মসীহ মানুষকে পুনরায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করবে এবং ধর্ম থেকে দূরত্বের কারণে সৃষ্ট ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংশোধন করবে। সুতরাং, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করেন এবং বিকৃত মত বিশ্বাসের সংশোধন করেন। আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি আর বর্তমানে আমরাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা মেনে চলছি এবং সমগ্র বিশ্বে সেই শিক্ষার প্রসার করছি। এই শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি মানবতার সেবাও করে চলেছি। আমরা দারিদ্রপীড়িত দেশগুলিতে স্কুল, হাসপাতাল আরম্ভ করেছি এবং মানবকল্যাণমূলক আরও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজও চলছে।

হুযুর বলেন: এই সমস্ত কাজ ছাড়াও আমার আরও অনেক দায়িত্বাবলী রয়েছে। হাজার হাজার মানুষ প্রত্যহ আমাকে দোয়ার জন্য আবেদন পত্র লেখে। অনেকে নিজেদের সমস্যাবলীর উল্লেখ করে সমাধান চান। আমি তাদের পথপ্রদর্শন করে থাকি।

অনেক ছাত্র নিজেদের শিক্ষার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করে যে, কোন বিষয় নির্বাচন করব বা কোন ক্ষেত্রে যাব। তাদেরকে গাইড করি। অনেক ছাত্র আবার শিক্ষা সহায়তার আবেদন করে। তাদের শিক্ষার খরচ আমরা দিয়ে থাকি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা সত্য যে, ইসলামের বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বহু বাধাবিপত্তি রয়েছে। কিন্তু আমাদের সংকল্প, পরিস্থিতি যতই প্রতিকুল হোক না কেন, যাবতীয় বাধাবিপত্তির মোকাবেলা করে আমরা ইসলামের বাণী পৌঁছাবই, ক্ষান্ত হব না। ভাল কথা মানুষ শুনবে এবং গ্রহণ করবে। সত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। অনেকে বার্তা পেয়ে স্বীকার করে যে তা সঠিক, কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের কারণে গ্রহণ করে না।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের নিজস্ব পৃথক কোন ধর্ম নেই। ইসলামই আমাদের ধর্ম এবং আমাদের নবী একজনই। একটিই কুরআন। আমাদের কোন নতুন ইসলাম নয়। আমাদের বিশ্বাস, কুরআন করীম অনুসারে সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ হল নিজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা। নিজেকে প্রবৃত্তির কলুষতা থেকে পবিত্র করা, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং শান্তি ও ভালবাসার বাণী প্রসার করা। বাকি রইল তরবারির জিহাদ যা সব থেকে নিম্ন পর্যায়ের জিহাদ এবং সেক্ষেত্রেও একাধিক শর্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে এও শর্ত রয়েছে যে, যখন তোমার বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করা হয় এবং জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় একমাত্র তখনই প্রতিরক্ষা করতে হবে।

আঁ হযরত (সা.) মক্কায় দশ বছর ছিলেন আর সেখানে তিনি কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অতঃপর তিনি মদীনা হিজরত করেন। মক্কার বিরোধী সৈন্যরা যখন মদীনার উপর আক্রমণ করল, তখন তাঁকে প্রতিরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হল। প্রতিরক্ষার আদেশ দেওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন, সেই সমস্ত মানুষকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হল যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। কেননা, তাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করার শক্তি রাখেন। (ক্রমশঃ....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 25 Oct, 2018 Issue No.43

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ...

নেই। হযরত উসমান (রা.)বলেন, আপনার মেয়েদের কাজে আসবে। তিনি বলেন, আপনার কি আমার মেয়েদের পরমুখাপেক্ষি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে? তিনি বলেন, মেয়েদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, প্রত্যেকদিন প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পড়বে। আমি মহানবীর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে সে কখনও অনাহার ক্লিষ্ট হবে না।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

এ ছিল খোদার ওপর আস্থা এবং অল্পে তুষ্ট থাকার দৃষ্টান্ত এসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের।

সালমা বিন তামাম বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সাথে সাক্ষাত করে এবং তার এক স্বপ্ন শোনাতে গিয়ে বলেন যে, আমি রাতের বেলায় আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি আর দেখেছি যে, মহানবী (সা.) এক উঁচু মিম্বরে উপবিষ্ট আছেন আর আপনি মিম্বরের নিচে। রসূলে করীম (সা.) বলছেন, হে ইবনে মাসউদ! আমার কাছে আস, আমার তিরোধানের পর তুমি অনেকটা জগৎ বিমুখতা অবলম্বন করেছো। তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ জিজ্ঞেস করেন, খোদার কসম! তুমি কি এ স্বপ্ন দেখেছো? সে ব্যক্তি বলেন, হ্যাঁ।এরপর তিনি বলেন, তুমি কি মদীনা থেকে আমার জানাযার নামায পড়ার জন্য এসেছ? তবে এর অর্থ হল আমার মৃত্যু সন্নিকটে। এর স্বল্পকাল পরেই তাঁর ইন্তেকাল হয়।(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত) কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হযরত উসমান (রা.) যখন তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পান তখন তাকে কুফা থেকে মদীনায় ডেকে পাঠান। কুফার মানুষ তাকে কুফাতেই অবস্থানের অনুরোধ করে বলে যে, আমরা আপনার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করব কিন্তু তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন না আর সে অবস্থায় হয়তো হযরত উসমান এমনিতেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যাইহোক, মনে হচ্ছে যে, তিনি সুস্থ অবস্থায় ছিলেন, যখন সেই ব্যক্তি স্বপ্ন শুনিয়েছিল। এরপর হযরত উসমান (রা.) তাকে কুফা থেকে মদীনায় ডেকে পাঠান, যদিও কুফাবাসীরা চাইত যে তিনি যেন সেখানেই অবস্থান করেন আর তারা বলে যে,আমরা আপনার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। কিন্তু তিনি বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের নির্দেশ এবং তাঁর আনুগত্য আমার জন্য আবশ্যক। একই সাথে তিনি এও বলেন যে, অচিরেই কিছু নৈরাজ্য মাথাচাঁড়া দিবে। আমি চাই না যে, এসব নৈরাজ্যের সূচনাকারী আমি হই। একথা বলে খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে ফিরে আসেন। তার মৃত্যু ৩২ হিজরীতে মদীনায় হয়। হযরত উসমান (রা.) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাহিত হন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ষাটের কিছু অধিক।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৭ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স সত্তরের অধিক ছিল। (আততাবকাতুল কুবরা ,অনুবাদক- আব্দুল্লাহ্ আল ইমাদি, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা: ২৩০, করাচির নাফিস একাডেমি থেকে প্রকাশিত) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের ইন্তেকালে হযরত আবু মুসা হযরত আবু মাসুদকে বলেন, আপনি কি মনে করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তাঁর পর এমন গুণাবলীর অধিকারী অন্য কোন ব্যক্তি রেখে গেছেন? হযরত আবু মাসুদ বলেন যে, সত্য কথা হল রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে যখন আমাদের যাওয়ার অনুমতি থাকত না তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেতেন। আর আমরা রসূলুল্লাহর বৈঠক থেকে যখন অনুপস্থিত থাকতাম তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তাঁর সেবার সুযোগ পেতেন এবং তার সাহচর্য থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হতেন। তাই এত গুণাবলীর অধিকারী অন্য কেউ কিভাবে হতে পারে?

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:১১৯ , ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ মহানবী (সা.)এর সুন্নতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একবার হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর দু'জন সাহাবীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাদের মাঝে একজন তাড়াতাড়ি রোযা খোলেন অর্থাৎ সূর্যাস্তের ঠিক পরেই ইফতার করেন, নামাযও তাড়াতাড়ি পড়েন। দ্বিতীয় সাহাবী উভয় কাজ কিছুটা বিলম্বে করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তাড়াতাড়ি কে করেন? তাঁকে বলা হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এমন করেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূলে করীম (সা.)এরও রীতি এটিই ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ যা করেন মহানবী (সা.) এর কর্মপন্থাও একই ছিল।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫১, হাদীস- ২৪৭১৬)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ সম্পর্কে আরো অনেক রেওয়ায়েত এবং ঘটনাবলী রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের আদর্শ এবং পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

*****❖*****❖*****❖*****

১ম পাতার শেষাংশ....

পন্থার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য পরবর্তী দ্বিতীয় সূরায় অর্থাৎ সূরা বাকারার শুরুতেই বলা হইয়াছে 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন' অর্থাৎ পুরস্কার লাভের পথ ইহাই, যাহা আমি (খোদাতা'লা) বর্ণনা করিতেছি।

সুতরাং এই দোয়া اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ একটি ব্যাপক দোয়া। ইহা বিষয়ের প্রতি মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে যে, ধর্মীয় ও পার্থিব বিপদাবলীর সময় সর্ব প্রথম যে বিষয়ের অন্বেষণ করা মানবের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য তাহা এই যে, সে তার উদ্দেশ্য লাভের জন্য 'সেরাতে মুস্তাকীম' অর্থাৎ সরল-সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত পথ সন্ধান করে। অর্থাৎ যে এইরূপ কোন প্রকৃষ্ট ও সরল-সুদৃঢ় পথ অন্বেষণ করে যদ্দারা সহজে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়, হৃদয় দৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ণ হয় এবং তাহার সকল সংশয় দূরীভূত হয়। কিন্তু ইঞ্জিলের শিক্ষানুসারে রুটি অন্বেষণকারী খোদা-অন্বেষণের পথ অবলম্বন করিবে না। রুটিই তাহার একমাত্র কাম্য। সুতরাং রুটি পাইয়া গেলে তাহার আর খোদার প্রয়োজন কি? এই কারণেই খৃষ্টানগণ সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং মানুষকে খোদা জ্ঞান করিবার মত লজ্জাজনক বিশ্বাস পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারি না, অন্যদের তুলনায় মসীহ্ ইব্নে মরিয়মের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যে কারণে তাঁহাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিবার ধারণা জন্মিল! মোজেযার দিক দিয়া পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীই তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যথা- মূসা, আল্‌ইয়াসা' ও ইলইয়াস নবীগণ; এবং যাহার হস্তে আমার প্রাণ, সেই অস্তিত্বের (খোদাতা'লার) শপথ করিয়া বলিতেছি- যদি মসীহ্ ইব্নে মরিয়ম আমার যুগে বর্তমান থাকিতেন তাহা হইলে আমি যাহা করিতে সক্ষম তাহা তিনি কখনও করিতে পারিতেন না, এবং যে সকল নিদর্শন আমার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তাহা কখনও প্রদর্শন করিতে পারিতেন না,* এবং তিনি নিজ অপেক্ষা আমার মধ্যে খোদাতা'লার 'ফজল' অধিক দেখিতে পাইতেন। আমার অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন একবার ভাবিয়া দেখ- সেই পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর মর্যাদা কত মহান যাঁহার দাসত্বের প্রতি আমি আরোপিত হইয়াছি। ذٰلِکَ فَضۡلُ اللّٰہِ یُؤۡتِیۡہِ مَنۡ یَّشَآءُ এস্থলে কোন হিংসা বা ঈর্ষা করা হইতেছে না। খোদাতা'লা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন। যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে. সে কেবল আপন অভিষ্টলাভে বিফলই হয় না, বরং মৃত্যুর পর জাহান্নামের পথ ধারণ করে। ধ্বংস হইয়াছে তাহারা যাহারা দুর্বল মানুষকে খোদা জ্ঞান করিয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে তাহারা যাহারা খোদাতা'লার মনোনীত এক বিশিষ্ট রসূলকে (সাঃ) গ্রহণ করে নাই। মুবারক (আশিসপ্রাপ্ত) তাহারা, যাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াছে। আমি খোদার সকল পথসমূহের মধ্যে সর্বশেষ পথ, এবং আমি তাঁহার যাবতীয় জ্যোতির মধ্যে সর্বশেষ জ্যোতিঃ। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে পরিত্যাগ করে, কারণ আমি ব্যতীত সব অন্ধকার।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৫২-৫৪)

بَجِّلُوا الْمَشَائِخَ

(বুযুর্গদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর)

কেননা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যুবকদের থেকে অধিক।

-হাদীস

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.